জাপান-যাত্রী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

শান্তিনিকেতন প্রেসে

শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বীরভূম।

শ্রাবণ, ১৩২৬

মূল্য একটাকা।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ কর্ত্তৃক
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত
২২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

জাপান-যাত্রী

১

বম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেচি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভাল লাগে না। কেননা যাত্রা করার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে, তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে আছে, তখন বিদায়ের আয়োজনটা এই জন্যেই কষ্টকর; কেন না, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের পক্ষে মুস্কিলের জায়গা,—সেখানে তাকে দুই উল্টো দিক সামলাতে হয়,—সে একরকমের কঠিন ব্যায়াম।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চলল না। অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল,—বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

বিদায় মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে,—সে ব্যথাটার প্রধান কারণ এই, জীবনে যা কিছুকে সব চেয়ে নির্দ্দিষ্ট করে' পাওয়া গেছে, তাকে অনির্দ্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ করে' যাওয়া। তার বদলে হাতে হাতে আর একটা কিছুকে পাওয়া না গেলে এই শূন্যতাটাই মনের মধ্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাওনাটা হচ্চে অনির্দ্দিষ্টকে ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্টের ভাণ্ডারের মধ্যে পেয়ে চলতে থাকা। অপরিচয়কে ক্রমে ক্রমে পরিচয়ের কোঠার মধ্যে ভুক্ত করে নিতে থাকা। সেই জন্যে যাত্রার মধ্যে যে দুঃখ আছে, চলাটাই হচ্চে তার ওষুধ। কিন্তু যাত্রা করলুম অথচ চল্লুম না—এটা সহ্য করা শক্ত।

অচল জাহাজের ক্যাবিন হচ্চে বন্ধনদশার দ্বিগুণ-চোলাই-করা কড়া আরক। জাহাজ চলে বলেই তার কাম্‌রার সঙ্কীর্ণতাকে আমরা ক্ষমা করি। কিন্তু জাহাজ যখন স্থির থাকে তখন ক্যাবিনে স্থির থাকা, মৃত্যুর ঢাকনাটার নীচে আবার গোরের ঢাক্‌নার মত।

ডেকের উপরেই শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার জাহাজে চড়েচি, অনেক কাপ্তেনের সঙ্গে ব্যবহার করেচি। আমাদের এই জাপানি কাপ্তেনের একটু বিশেষত্ব আছে। মেলামেশায় ভালমানুষিতে হঠাৎ মনে হয় ঘোরো লোকের মত। মনে হয় এঁকে অনুরোধ করে' যা-খুসি-তাই করা যেতে পারে,—কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় নিয়মের লেশমাত্র নড়চড় হবার জো নাই। আমাদের সহযাত্রী ইংরেজ

বন্ধু ডেকের উপরে, তাঁর ক্যাবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ঘাড় নড়ল, সে ঘটে উঠল না। সকালে ব্রেক্‌ফাস্টের সময় তিনি যে টেবিলে বসেছিলেন, সেখানে পাখা ছিল না; আমাদের টেবিলে জায়গা ছিল, সেই দেখে তিনি আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছা জানালেন। অনুরোধটা সামান্য, কিন্তু কাপ্তেন বল্লেন, এবেলাকার মত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ডিনারের সময় দেখা যাবে। আমাদের টেবিলে চৌকি খালি রইল, কিন্তু তবু নিয়মের ব্যত্যয় হল না। বেশ বোঝা যাচ্চে, অতি অল্পমাত্রও ঢিলেঢালা কিছু হতে পারবে না।

রাত্রে বাইরে শোয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করচে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পষ্টতাও নেই। জাহাজের আলো-গুলো মস্ত একটা আয়তনের সূচনা করেচে, কিন্তু কোনো আকারকে দেখ্‌তে দিচ্চে না।

কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে, আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর একথাই মনে হয় যে দিনের বেলাটা মর্ত্ত্যলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে' দেখতে চায়, এই জন্যে এত বড় একটা আলো জ্বালতে হয়েচে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ

নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এই জন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

কিন্তু মানুষের কারখানা যখন আলো জ্বালিয়ে সেই রাত্রিকেও অধিকার করতে চায়, তখন কেবল যে মানুষই ক্লিষ্ট হয় তা নয়,—দেবতাকেও ক্লিষ্ট করে তোলে। আমরা যখন থেকে বাতি জ্বেলে রাত জেগে এগ্‌জামিন পাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েচি, তখন থেকে সূর্য্যের আলোয় সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট নিজের সীমানা লঙ্ঘন করতে লেগেচি, তখন থেকেই সুর-মানবের যুদ্ধ বেধেচে। মানুষের কারখানা-ঘরের চিম্‌নিগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজের অন্তরের কালীকে দ্যুলোকে বিস্তার করচে, সে অপরাধ তেমন গুরুতর নয়,—কেন না দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালী মাখালেও দেবতা তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো করে দেয়, তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে। সে যেন নিজের দখল অতিক্রম করে আলোকের খুঁটি গেড়ে দেবলোকে আপন সীমানা চিহ্নিত করতে চায়।

সেদিন রাত্রে গঙ্গার উপরে সেই দেববিদ্রোহের বিপুল আয়োজন দেখ্‌তে পেলুম। তাই মানুষের ক্লান্তির উপর সুরলোকের শান্তির আশীর্ব্বাদ দেখা গেল না। মানুষ বল্‌তে চাচ্চে আমি-ও দেবতার মত, আমার ক্লান্তি নেই। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা—এইজন্যে সে চারিদিকের শান্তি নষ্ট করচে। এইজন্যে

অন্ধকারকেও সে অশুচি করে তুলেচে।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্ম্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মত,—তা অঞ্জনের মত কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মত,—তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখ্‌লুম। মনে হল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে' রয়েচেন।

এম্‌নি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপরে তেল ভাসচে, মানুষের আবর্জ্জনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারচে না। সেই রাত্রে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্রিকেও যখন কলঙ্কিত দেখলুম তখন মনে হল একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন—আজ মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন্‌ রুদ্র রক্ষা করবেন ?

২

জাহাজ ছেড়ে দিলে। মধুর বহিচে বায়ু ভেসে চলি রঙ্গে। কিন্তু এর রঙ্গটা কেবলমাত্র ভেসে চলার মধ্যেই নয়। ভেসে চলার একটি বিশেষ দৃষ্টি ও সেই বিশেষ দৃষ্টির বিশেষ রস আছে। যখন হেঁটে চলি তখন কোনো অখণ্ড ছবি চোখে পড়ে না। ভেসে চলার মধ্যে দুই বিরোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েচে—

বসেও আছি, চল্‌চিও। সেই জন্যে চলার কাজ হচ্চে, অথচ চলার কাজে মনকে লাগাতে হচ্চে না। তাই মন, যা সামনে দেখচে তাকে পূর্ণ করে' দেখ্‌চে। জল স্থল আকাশের সমস্তকে এক করে মিলিয়ে দেখ্‌তে পাচ্চে।

ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর একটা গুণ হচ্চে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বদ্ধ করে না। না দেখতে পেলেও চল্‌ত, কোনো অসুবিধে হত না, পথ ভুল্‌তুম না, গর্ত্তয় পড়তুম না। এই জন্যে ভেসে চলার দেখাটা হচ্চে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন দেখা,—দেখাটাই তার চরম লক্ষ্য—এই জন্যেই এই দেখাটা এমন বৃহৎ, এমন আনন্দময়।

এতদিনে এইটুকু বোঝা গেছে যে, মানুষ নিজের দাসত্ব করতে বাধ্য, কিন্তু নিজের সম্বন্ধেও দায়ে-পড়া কাজে তার প্রীতি নেই। যখন চলাটাকেই লক্ষ্য করে পায়চারি করি, তখন সেটা বেশ; কিন্তু যখন কোথাও পৌঁছবার দিকে লক্ষ্য করে চল্‌তে হয়, তখন সেই চলার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিতেই মানুষের সম্পদ প্রকাশ পায়। ধন জিনিষটার মানেই এই—তাতে মানুষের প্রয়োজন কমায় না কিন্তু নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বাধ্যতা কমিয়ে দেয়। খাওয়া পরা, দেওয়া নেওয়ার দরকার তাকে মেটাতেই হয়, কিন্তু তার বাইরে যেখানে তার উদ্বৃত্ত সেইখানেই মানুষ মুক্ত, সেইখানেই সে বিশুদ্ধ নিজের পরিচয় পায়। এই জন্যেই ঘটিবাটি প্রভৃতি দরকারী জিনিষকেও মানুষ সুন্দর করে' গড়ে' তুলতে চায়—

কারণ, ঘটিবাটির উপযোগিতা মানুষের প্রয়োজনের পরিচয় মাত্র কিন্তু তার সৌন্দর্য্যে মানুষের নিজেরই রুচির নিজেরই আনন্দের পরিচয়। ঘটিবাটির উপযোগিতা বলচে মানুষের দায় আছে, ঘটিবাটির সৌন্দর্য্য বলচে মানুষের আত্মা আছে।

আমার না হলেও চলত, কেবল আমি ইচ্ছা করে' করচি এই যে মুক্ত কর্তৃত্বের ও মুক্ত ভোক্তৃত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্বস্রষ্টার এবং বিশ্বরাজেশ্বরের,—সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। এই রাজ্যটি মুক্ত মানুষের রাজ্য, এখানে জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেই।

আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেরুয়া নদীর সাড়ি পরে' আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, আমি তাকে দেখচি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমিটী যদি নিজেকে ভাষায় বা রেখায় প্রকাশ করত, তাহলে সেইটেই হত সাহিত্য, সেইটেই হত আর্ট। খামকা বিরক্ত হয়ে এমন কথা কেউ বলিতে পারে "তুমি দেখ্চ তাতে আমার গরজ কি? তাতে আমার পেটও ভরবে না, আমার ম্যালেরিয়াও ঘুচবে না, তাতে আমার ফসল-ক্ষেতে বেশি করে ফসল ধরবার উপায় হবে না।" ঠিক কথা। আমি যে দেখচি এতে তোমার কোন গরজ নেই। অথচ আমি যে শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা, এ সম্বন্ধে বস্তুতই যদি তুমি উদাসীন হও—তাহলে জগতে আর্ট এবং সাহিত্য সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না।

আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, আজ এতক্ষণ ধরে'

তুমি যে লেখাটা লিখচ, ওটাকে কি বল্‌বে? সাহিত্য, না তত্ত্বালোচনা।

নাই বল্লুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে ব্যক্তি আলোচনা করে, সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ্য। এই যে শাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নীচে শ্যামল-ঐশ্বর্য্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হয়ে চলেচে, তার মাঝখানে প্রধানত প্রকাশ পাচ্চে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হত, তাহলে এই আমিকে সরে' দাঁড়াতে হত। কিন্তু এক-আমির পক্ষে আর-এক আমির অহেতুক প্রয়োজন আছে, এই জন্য সময় পেলেই আমরা ভূতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে সেই আমির সন্ধান করি।

তেম্‌নি করেই কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যেও যে ভেসে চলেচে, সেও সেই দ্রষ্টা-আমি। সেখানে, যা বল্‌চে সেটা উপলক্ষ্য, যে বল্‌চে সেই লক্ষ্য। বাহিরের বিশ্বের রূপধারার দিকেও আমি যেমন তাকাতে তাকাতে চলেচি, আমার অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও আমি তেমনি চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেচি। এই ধারা কোনো বিশেষ কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজনের সূত্রে বিধৃত নয়। এই ধারা প্রধানত লজিকের দ্বারাও গাঁথা নয়, এর গ্রন্থনসূত্র মুখ্যত আমি। সেইজন্যে আমি কেয়ারমাত্র করিনে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্ষ্যমান রচনাটিকে লোক পাকা কথা বলে গ্রহণ করিবে কি না। বিশ্বলোকে এবং

চিত্তলোকে "আমি দেখচি" এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্চে আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক করে বল্‌তে পারি তাহলে অন্য সকল আমির দলও বিনা প্রয়োজনে খুসি হয়ে উঠবে।

উপনিষদে লিখচে, এক-ডালে দুই পাখী আছে, তার মধ্যে এক পাখী খায়, আর এক পাখী দেখে। যে পাখী দেখচে তারি আনন্দ বড় আনন্দ; কেন না, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখী আছে। এক পাখীর প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখীর প্রয়োজন নেই। এক পাখী ভোগ করে আর-এক পাখী দেখে। যে-পাখী ভোগ করে সে নির্ম্মাণ করে, যে পাখী দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্ম্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা; অর্থাৎ যেটা তৈরি করা হচ্চে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা,—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্চে নিজেকে সর্জ্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এই জন্যে ভোগী পাখী যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করচে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখীর উপকরণ হচ্চে আমি পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্ত্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় রহস্য, দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্চে

না,—হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখ্‌তে চেষ্টা করচে। যা-কিছু ঘট্‌চে এবং যা-কিছু ঘট্‌তে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখ্‌চে।

এই যে আমার এক-আমি, এ বহুর মধ্যে দিয়ে চলে' চলে' নিজেকে নিত্য উপলব্ধি করতে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হচ্চে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

তোসা মারু জাহাজ
২০শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৩

বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাক্‌তেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েচে। তীর কূলের বেড়ি খসে' গেচে। কিন্তু এখনও তার মাটীর রং ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয় নি,—কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক-দিগন্তের মালা বদল করেচে। যে ঢেউ দিয়েচে, নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মত তার ছোট ছোট পদ বিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা—কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দ্দূল বিক্রীড়িত সুরু হয় নি।

আমাদের জাহাজের নীচের তলার ডেকে অনেকগুলি ডেক প্যাসেঞ্জার; তাদের অধিকাংশ মান্দ্রাজি, এবং তারা প্রায়

সকলেই রেঙ্গুনে যাচ্চে। তাদের পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। জাহাজের ভাণ্ডার থেকে তারা প্রত্যেকে একখানি করে' ছবি আঁকা কাগজের পাখা পেয়ে ভারি খুসি হয়েচে।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচান কারো সাধ্য নয়। কোন মতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্চে। একটা জিনিষ ভারি চোখে লাগে, সে হচ্চে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার—কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে,—বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিব্‌ড়ে অতি সহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই,—যেখানে বসে খাচ্চে তার নেহাৎ কাছে ছিব্‌ড়ে ফেলচে;—এমনি করে' চারিদিকে কত আবর্জ্জনা যে জমে উঠ্‌চে তাতে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে। (আচারকে শক্ত করে তুলে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়।) বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।

এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আছে; পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে তারা যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা। ভাল কাপড়টি পরে' টুপিটি বাগিয়ে

তারা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌তে চায়। একটু মাত্র পরিচয় হলেই অথবা না হলেও তারা দেখা হলেই প্রসন্ন মুখে সেলাম করে। বোঝা যায় তারা বাইরের সংসারটাকে মানে। কেলবমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে-বাঁধা নয় বলে' বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এই জন্যে আদব কায়দা মুসলমানের। আদব কায়দা হচ্চে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায় মা মাসী মামা পিসের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কিরকম হবে ;—কিন্তু সাধারণ-ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কিরকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই। এই জন্যে সম্পর্ক-বিচার ও জাতি-বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেচে। কেননা, প্রণাম নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতের মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্ব্বে আমরা অস্বীকার করে' চলেছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েচি, নয় ইংরাজের কাছ থেকে নিচ্চি। ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেই জন্যে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না।

বাঙালী ভদ্রসভায় সাজসজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর ভিতরকার সাজ,—সুতরাং বাহিরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বল্লেই হয়,—অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যেরকম, অর্থাৎ দিগ্‌বসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুড়ো দিদি মাসী প্রভৃতি কোন-একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি,—নইলে আমরা থই পাইনে। হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, নয় অত্যন্ত দূরত্ব, এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে, সেটা আজো আমাদের ভাল করে' আয়ত্ত হয় নি। এমন কি, সেখানকার বিধিবন্ধনকে আমরা হৃদ্যতার অভাব বলে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যে-সব মানুষকে হৃদয় দিতে পারিনে, তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে আমরা কৃত্রিম বলে' গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ বলেই এই সাধারণ আদব-কায়দাকে আমাদের কৃত্রিম বলে' ঠেকে। বস্তুত ঘরের মানুষকে আত্মীয় বলে', এবং তার বাইরের মানুষকে আপন সমাজের বলে', এবং তারো বাইরের মানুষকে মানব সমাজের বলে' স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, এবং আদবকায়দার বন্ধন,—এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।

কাপ্তেন বলে' রেখেচেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঝড় হবে, ব্যারোমিটার নাবচে। কিন্তু শান্ত আকাশে সূর্য্য অস্ত গেল।

বাতাসে যে-পরিমাণ বেগ থাক্‌লে তাকে মন্দ পবন বলে, অর্থাৎ যুবতীর মন্দ গমনের সঙ্গে কবিরা তুলনা করতে পারে,—এ তার চেয়ে বেশি; কিন্তু ঢেউগুলোকে নিয়ে রুদ্রতালের করতাল বাজাবার মত আসর জমেনি,—যেটুকু খোলের বোল দিচ্চে তাতে ঝড়ের গৌরচন্দ্রিকা বলেও মনে হয়নি। মনে করলুম মানুষের কুষ্ঠির মত, বাতাসের কুষ্ঠি গণনার সঙ্গে ঠিক মেলে না,—এ যাত্রা ঝড়ের ফাঁড়া কেটে গেল। তাই পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠিপত্র সমর্পণ করে' দিয়ে প্রসন্ন সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বস্‌লুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানী দরোয়ানদের খচমচির মত বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠ্‌ল। জলের উপর সূর্য্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন করে' নীলাম্বরীর ঘোমটা-পরা সন্ধ্যা এসে বস্‌ল। আকাশে তখনও মেঘ নেই, আকাশ-সমুদ্রের ফেনার মতই ছায়াপথ জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল।

ডেকের উপর বিছানা করে' যখন শুলুম, তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চল্‌চে,—একদিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েচে, আর একদিকে ছল্ ছল্ শব্দে জবাব দিচ্চে, কিন্তু ঝড়ের পালা বলে' মনে হলনা। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি করে' কখন্ এক সময় চোখ বুজে এল।

রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লুম আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোন একটি

বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে' সেইটে কাকে বুঝিয়ে বল্‌চি। আশ্চর্য্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্ত্তস্বরের মত, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেচে। সমুদ্র চামুণ্ডার মত ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করচে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেচে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই,—বল্‌চে, যা' থাকে কপালে। আর জলে যে বিষম গর্জ্জন উঠ্‌চে, তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হতে লাগ্‌ল। মাল্লারা ছোট ছোট লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাচল করচে,— কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সঙ্কেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্চে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বাইরে জলবাতাসের গর্জ্জন, আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজ্‌তে লাগল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউয়ের মতই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাক্‌ল,—ঘুমচ্চি কি জেগে আছি বুঝতে পারচি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, সকাল-বেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হল। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলি বাকি অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে

ভ্রূকুটি করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জল-ধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গা-ধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু এ কোন্ নারদ প্রলয়-বীণা বাজাচ্চে? এর সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেচে।

এপর্য্যন্ত জাহাজের নিত্যক্রিয়া এক রকম চলে যাচ্চে, এমন কি আমাদের প্রাতরাশেরও ব্যাঘাত হল না। কাপ্তেনের মুখে কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি বল্লেন এই সময়টাতে এমন একটু আধটু হয়ে থাকে;—আমরা যেমন যৌবনের চাঞ্চল্য দেখে বলে' থাকি, ওটা বয়সের ধর্ম্ম।

ক্যাবিনের মধ্যে থাক্‌লে ঝুমঝুমির ভিতরকার কড়াইগুলোর মত নাড়া খেতে হবে তার চেয়ে খোলাখুলি ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করাই ভাল। আমরা শাল কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজের ডেকের উপর গিয়েই বস্‌লুম। ঝড়ের ঝাপট পশ্চিম দিক থেকে আসচে, সেইজন্যে পূর্ব্বদিকের ডেকে বসা দুঃসাধ্য ছিল না।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চল্ল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রং নেই,—চারিদিক ঝাপসা, বিবর্ণ। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিল তার ঢাকনা খুল্‌তেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মত পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য

বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেচে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মত লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়চে।

জাপানী মাল্লারা ছুটোছুটি করচে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা করচে মাত্র ;—পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ, তবু সে সব বাধা ভেদ করে' এক একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়চে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠচে। কাপ্তেন আমাদের বারবার বল্লেন,—ছোট ঝড় সামান্য ঝড়। এক সময় আমাদের স্টুয়ার্ড এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে ঝড়ের খাতিরে জাহাজের কিরকম পথ বদল হয়েচে, সেইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে ; ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কম্বল সমস্ত ভিজে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েচে। আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাকতে পারলুম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বসলুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলচে না, তার কারণ জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মত দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা

অনেকবার মনে হল। চারিদিকেই ত মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত মৃত্যু—আমার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোটটার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব, আর এই এত বড়টাকে কিছু বিশ্বাস করব না?—বড়র উপরে ভরসা রাখাই ভাল।

ডেকে বসে থাকা আর চল্‌চে না। নীচে নাবতে গিয়ে দেখি সিঁড়ি পর্য্যন্ত জুড়ে সমস্ত রাস্তা ঠেসে ভর্ত্তি করে' ডেক্-প্যাসেঞ্জার বসে। বহু কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে ক্যাবিনের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এইবার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে উঠ্‌ল। মনে হল দেহের সঙ্গে প্রাণের আর বন্‌তি হচ্চে না; দুধ মথন করলে মাখনটা যে রকম ছিন্ন হয়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হয়ে এসেচে। জাহাজের উপরকার দোলা সহ্য করা যায়, জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ্য করা শক্ত। কাঁকরের উপর দিয়ে চলা, আর জুতার ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাৎ, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে বন্ধন নেই, আর একটাতে বেঁধে মার।

ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে পেলুম ডেকের উপর কি যেন হুড়মুড় করে ভেঙে ভেঙে পড়চে। ক্যাবিনের মধ্যে হাওয়া আসবার জন্যে যে ফানেলগুলো ডেকের উপর হাঁ করে নিশ্বাস নেয়, ঢাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েচে,—কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল চোটে তার ভিতর দিয়েও ঝলকে ঝলকে ক্যাবিনের মধ্যে জল এসে পড়চে। বাইরে উনপঞ্চাশ বায়ুর

নৃত্য, অথচ ক্যাবিনের মধ্যে গুমট। একটা ইলেকট্রিক পাখা চল্‌চে তাতে তাপটা যেন গায়ের উপর ঘুরে ঘুরে লেজের ঝাপটা দিতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ মনে হয় এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে শরীর মন প্রাণের চেয়েও বড় একটা সত্তা আছে। ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নীচে যেমন শান্ত সমুদ্র—সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়, মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুচ্চে সেইরকম একটি বিরাট শান্ত পুরুষ আছে—বিপদ এবং দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে তাকে পাওয়া যায়—দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড় চাপড় খেয়েচে, তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ্-বোট জখম হয়েচে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েচে। জাপানী মাল্লারা এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণ সংশয় ছিল। জাহাজ যে বরাবর আসন্ন সঙ্কটের সঙ্গে লড়াই করেচে, তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল—জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক সময়ে এগুলো বের করবার কথা কাপ্তেনের মনে এসেছিল।—কিন্তু

ঝড়ের পালার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট করে' আমার মনে পড়চে জাপানী মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি। আশ্চর্য্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি, ঝড়ের পর যেমন তার দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা করতে পারচে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠচে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম,— ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল, কিন্তু পরের দিন ভুলতে পারচে না তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েচে।

আজ রবিবার। জলের রং ফিকে হয়ে উঠেচে। এতদিন পরে আকাশে একটি পাখী দেখতে পেলুম—এই পাখীগুলিই পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন করে নিয়ে যায়—আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা'-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের—তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে সুর নেই—সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্চে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্চে গতি। সমুদ্র হচ্চে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্চে শব্দলোক।

আজ বিকেলে চারটে পাঁচটার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত পৃথিবীতে নানা খবর চলাচল করছিল, আমাদের জন্যে সেগুলো সমস্ত জমে রয়েচে;—

বাণিজ্যের ধনের মত নয় প্রতিদিন যার হিসাব চল্‌চে ; কোম্পানির কাগজের মত, অগোচরে যার সুদ জম্‌চে।

২৪শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৪

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণে রেঙ্গুনে পৌঁছন গেল।

চোখের পিছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানে দেখাগুলো বেশ করে' হজম হয়ে না গেলে সেটাকে নিজের করে' দেখানো যায় না। তা' নাইবা দেখানো গেল— এমন কথা কেউ বল্‌তে পারেন। যেখানে যাওয়া গেছে সেখান্‌কার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কি ?

দোষ না থাক্‌তে পারে,—কিন্তু আমার অভ্যাস অন্যরকম। আমি টুঁকে যেতে টেঁকে যেতে পারিনে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েচি, কিন্তু সে সমস্ত টুক্‌রো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে ছড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার।

ছুটতে ছুটতে তাড়াতাড়ি দেখে দেখে বেড়ানো আমার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নিস্ফল। অতএব আমার কাছ থেকে বেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত তোমরা পাবে না। আদালতে সত্যপাঠ করে'

আমি সাক্ষী দিতে পারি যে, রেঙ্গুন নামক এক সহরে আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে আদালতে আরো বড় রকমের সত্যপাঠ করতে হয়, সেখানে আমাকে বলতেই হবে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।

এমন হতেও পারে রেঙ্গুন সহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার, বাড়িগুলি তক্‌তক্ করচে, রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্চে, তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙীন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখ্‌তে পাই, তখন মনে হয় এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয়, বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি—রেঙ্গুন সহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের সহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মত।

প্রথমত ইরাবতী নদী দিয়ে সহরের কাছাকাছি যখন আসচি, তখন ব্রহ্মদেশের প্রথম পরিচয়টা কি? দেখি তীরে বড় বড় সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিম্‌নি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিৎ হয়ে পড়ে বর্ম্মা চুরুট খাচ্চে। তার পরে যত এগোতে থাকি, দেশ বিদেশের জাহাজের ভিড়। তারপর যখন ঘাটে এসে পৌঁচই, তখন তট বলে পদার্থ দেখা যায় না—সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জোঁকের মত ব্রহ্মদেশের গায়ে একবারে ছেঁকে ধরেচে। তারপরে আপিস, আদালত, দোকান, বাজারের মধ্যে দিয়ে আমার বাঙালী বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম, কোনো ফাঁক

দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখ্‌তে পেলুম না। মনে হল রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে আছে, কিন্তু দেশে নেই। অর্থাৎ এ সহর দেশের মাটি থেকে গাছের মত ওঠে নি, এ সহর কালের স্রোতে ফেনার মত ভেসেচে,—সুতরাং এর পক্ষে এ জায়গাও যেমন, অন্য জায়গাও তেমনি।

আসল কথা পৃথিবীতে যে-সব সহর সত্য তা' মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেচে। দিল্লি বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেচে। কিন্তু বাণিজ্য-লক্ষ্মী নির্ম্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্য্য-শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়,—যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আস্‌ছিল, তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দ্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসেচি। ওর মনে প্রীতি নেই বলেই বাংলা দেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেচে।

আমি মনে করি আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্য্যতার লোহ-বন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলি পর্য্যন্ত, গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আস্‌ছিল, আমি তার আগেই জন্মেচি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মত গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন করে' ধরে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীর তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌ত। একদিকে

দেশের হৃদয়ের ধারা, আর একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিৎ বিচ্ছেদ দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে' দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেই জন্যেই কলকাতা আধুনিক সহর হলেও, কোকিল শিশুর মত তার পালন-কর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত করে' অধিকার করে নি। কিন্তু তারপরে বাণিজ্য-সভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগল, ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চল্‌ল। এখন কলকাতা বাংলা দেশকে আপনার চারিদিক থেকে নির্ব্বাসিত করে' দিচ্চে,—দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্ত্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে' কালো নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল।

এক সময়ে মানুষ বলেছিল, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে-পরিচয় পেয়েছিল সে ত কেবল ঐশ্বর্য্যে নয়, তার সৌন্দর্য্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতীর, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারু-কার্য্যের মনের মিল ছিল। এইজন্যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনাকে ঐশ্বর্য্যে বিচিত্র করে সুন্দর করে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তাঁর পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে? যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন, তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেষ্টরের তুলনা

করলেই তফাৎটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। জেনিসে সৌন্দর্য্যে এবং ঐশ্বর্য্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েচে, ম্যাঞ্চেষ্টরে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েচে। এই জন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্য্যতায় নির্ম্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্চে। তাই নিয়ে কাটাকাটি হানাহানির আর অন্ত নেই; তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধরাতল পঙ্কিল হয়ে উঠল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েচেন কালী; তাঁর অন্ন পরিবেষণের হাতা আজ হয়েচে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল। যাই হোক্, আমার বলবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।

তাই বলচি, রেঙ্গুন ত দেখলুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোন পরিচয় নেই;—সেখান থেকে আমার বাঙালী বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আনতে পারি নি। কথাটা হয়ত একটু অত্যুক্তি হয়ে পড়ল। আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। সোমবার দিনে সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা এবসট্রাকশন্ সে একটা আচ্ছিন্ন পদার্থ। সে

একটা সহর, কিন্তু কোনো-একটা সহরই নয়। এখন যা দেখছি, তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুসি হয়ে, সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। আধুনিক বাঙালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখ্‌তে পাই; তারা খুব গট্‌গট্‌ করে' চলে, খুব চট্‌পট্‌ করে ইংরেজি কয়—দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে,—মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড় করে দেখ্‌চি, বাঙালীর মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালী-ঘরের কল্যাণীকে দেখ্‌লে তখনি বুঝিতে পারি এ ত মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মত এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলমল করচে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক না কেন, এটা ফাঁকা নয়—যেটুকু চোখে পড়চে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন সহরটা এর কাছে ছোট হয়ে গেল—বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।

প্রথমেই বাইরের প্রখর আলো থেকে একটি পুরাতন কালের পরিণত ছায়ার মধ্যে এসে প্রবেশ করলুম। থাকে থাকে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে চলেচে—তার উপরে আচ্ছাদন। এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল, ফুল, বাতি, পূজার অর্ঘ্য বিক্রি চল্‌চে। যারা বেচ্‌চে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হয়ে মন্দিরের ছায়াটি

সূর্য্যাস্তের আকাশের মত বিচিত্র হয়ে উঠেচে। কেনাবেচার কোন নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদারেরা বিলাতি মণিহারির দোকান খুলে বসে গেছে। মাছ মাংসেরও বিচার নেই, চারিদিকে খাওয়া দাওয়া ঘরকন্না চল্‌চে। সংসারের সঙ্গে মন্দিরের সঙ্গে ভেদমাত্র নেই—একেবারে মাখামাখি। কেবল, হাটবাজারে যেরকম গোলমাল, এখানে তা' দেখা গেল না। চারিদিক নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, এই মন্দির সোপানে মাছ-মাংস কেনাবেচা এবং খাওয়া চল্‌চে, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন, বুদ্ধ আমাদের উপদেশ দিয়েচেন—তিনি বলে' দিয়েচেন কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে তার বন্ধন; তিনি ত জোর করে কারো ভালো করতে চান নি; বাহিরের শাসনে কল্যাণ নেই, অন্তরের ইচ্ছাতেই মুক্তি; এই জন্যে আমাদের সমাজে বা মন্দিরে আচার সম্বন্ধে জবরদস্তি নেই।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানাস্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য্য নেই, কারুকার্য্যের ঠেসাঠেসি ভিড়—সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মত। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না—এ যেন ছেলে-ভুলোনো ছড়ার মত; তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা'-খুসি-তাই এসে পড়েচে, ভাবে পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই। বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখানকার নিতান্ত সস্তাদরের তুচ্ছতা

একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসঙ্গতি ব'লে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা' যেন একেবারে জানেই না। আমাদের কলকাতায় বড়মানুষের ছেলের বিবাহ-যাত্রায় রাস্তা-দিয়ে যেমন সকল রকমের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের বন্যা বয়ে যায়—কেবলমাত্র পুঞ্জীকরণটাই তার লক্ষ্য, সজ্জীকরণ নয়,—এও সেই রকম। এক ঘরে অনেকগুলো ছেলে থাক্‌লে যেমন গোলমাল করে, সেই গোলমাল করাতেই তাদের আনন্দ—এই মন্দিরের সাজসজ্জা, প্রতিমা, নৈবেদ্য, সমস্ত যেন সেইরকম, ছেলেমানুষের উৎসব—তার মধ্যে অর্থ নেই, শব্দ আছে। মন্দিরের ঐ সোনা-বাঁধানো পিতল-বাঁধানো চূড়াগুলি ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দের উচ্চহাস্য মিশ্রিত হো হো শব্দ—আকাশে ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌চে। এদের যেন বিচার করবার, গম্ভীর হবার বয়স হয়নি। এখানকার এই রঙিন মেয়েরাই সব চেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখাপ্রশাখা ভরে এরা যেন ফুল ফুটে রয়েচে। ভুঁইচাঁপার মত এরাই দেশের সমস্ত—আর কিছু চোখে পড়ে না।

লোকের কাছে শুন্‌তে পাই, এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়; অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে' থাকে। হঠাৎ মনে আসে এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েচে। কিন্তু ফলে ত তার উল্টোই দেখ্‌তে পাচ্চি—এই কাজকর্ম্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি করে' বিকশিত হয়ে উঠেচে। কেবল বাইরে

বেরতে পারাই যে মুক্তি তা' নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড় মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড় বন্ধন নয়, কাজের সঙ্কীর্ণতাই হচ্চে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেচে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে নেই। রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা' আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠিন পরিশ্রম করে—কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্ত্তিটিকে সুব্যক্ত করে' তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে, তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গীতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীট্‌স্ বলেচেন, সত্যই সুন্দর অর্থাৎ সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য্য। সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি—আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি; অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্চেন, সেইখানেই তাঁর অমৃতরূপ আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে, লোভে, ঈর্ষায় মূঢ়তায়, প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই

অনেক সময় বড় নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর করে' থাকে।

তোসা-মারু জাহাজ,
২৭শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৫

২৯ বৈশাখ। বিকেলের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকচি, আমাদের সঙ্গে যে বালকটি এসেচে, তার নাম মুকুল, সে বলে' উঠ্‌ল, ইস্কুলে একদিন পিনাং সিঙাপুর মুখস্থ করে' মরেচি—এ সেই পিনাং। তখন আমার মনে হল ইস্কুলের ম্যাপে পিনাং দেখা যেমন সহজ ছিল, এ তার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। তখন মাষ্টার ম্যাপে আঙুল বুলিয়ে দেশ দেখাতেন, এ হচ্চে জাহাজ বুলিয়ে দেখানো।

এরকম ভ্রমণের মধ্যে "বস্তুতন্ত্রতা" খুব সামান্য। বসে' বসে' স্বপ্ন দেখবার মত। না করচি চেষ্টা, না করচি চিন্তা, চোখের সামনে আপনা আপনি সব জেগে উঠ্‌চে। এই সব দেশ বের করতে, এর পথ ঠিক করে' রাখ্‌তে, এর রাস্তাঘাট পাকা করে' তুলতে, অনেক মানুষকে অনেক ভ্রমণ এবং অনেক দুঃসাহস করতে হয়েচে, আমরা সেই সমস্ত ভ্রমণ ও দুঃসাহসের বোতলে-ভরা মোরব্বা উপভোগ করচি যেন। এতে কোন কাঁটা নেই, খোসা নেই, আঁটি নেই,—কেবল শাঁসটুকু আছে,

আর তার সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি মেশানো। অকূল সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠ্‌চে, দিগন্তের পর দিগন্তের পর্দা উঠে উঠে যাচ্ছে, দুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি; অথচ আলিপুরে খাঁচার সিংহটার মত তাকে দেখে আমোদ বোধ করচি; ভীষণও মনোহর হয়ে দেখা দিচ্চে।

আরবা-উপন্যাসে আলাদিনের প্রদীপের কথা যখন পড়েছিলুম, তখন সেটাকে ভারি লোভনীয় মনে হয়েছিল। এ ত সেই প্রদীপেরই মায়া। জলের উপরে স্থলের উপরে সেই প্রদীপটা ঘসচে, আর অদৃশ্য দৃশ্য হচ্চে, দূর নিকটে এসে পড়চে। আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আর জায়গাগুলোই আমাদের সামনে এসে পড়চে।

কিন্তু মানুষ ফলটাকেই যে মুখ্যভাবে চায় তা নয়, ফলিয়ে তোলানোটাই তার সব চেয়ে বড় জিনিষ। সেই জন্যে, এই যে ভ্রমণ করচি, এর মধ্যে মন একটা অনুভব করচে—সেটি হচ্চে এই যে, আমরা ভ্রমণ করচিনে। সমুদ্রপথে আস্‌তে আস্‌তে মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটা পাহাড় দেখা দিচ্ছিল, আগাগোড়া গাছে ঢাকা; ঠিক যেন কোন্‌ দানবলোকের প্রকাণ্ড জন্তু তার কোঁকড়া সবুজ রোঁয়া নিয়ে সমুদ্রের ধারে ঝিমতে ঝিমতে রোদ পোয়াচ্চে; মুকুল তাই দেখে বল্লে ঐখানে নেমে যেতে ইচ্ছা করে। ঐ ইচ্ছাটা হচ্চে সত্যকার ভ্রমণ করবার ইচ্ছা। অন্য কর্ত্তৃক দেখিয়ে দেওয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নিজে দেখার ইচ্ছা। ঐ পাহাড়-ওয়ালা ছোট ছোট

দ্বীপগুলোর নাম জানিনে; ইস্কুলের ম্যাপে ও-গুলোকে মুখস্থ করতে হয় নি; দূর থেকে দেখে মনে হয় ওরা একেবারে তাজা রয়েচে, সার্কুলেটিং লাইব্রেরির বইগুলোর মত মানুষের হাতে হাতে ফিরে নানা চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে যায় নি; সেই জন্যে মনকে টানে। অন্যের পরে মানুষের বড় ঈর্ষা। যাকে আর কেউ পায় নি, মানুষ তাকে পেতে চায়। তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে।

সূর্য্য যখন অস্ত যাচ্চে, তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছল। মনে হল বড় সুন্দর এই পৃথিবী। জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখ্‌লুম। ধরণী তার দুই বাহু মেলে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করচে। মেঘের ভিতর দিয়ে নীলাভ পাহাড়গুলির উপরে যে একটি সুকোমল আলো পড়চে সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালি রঙের ওড়নার মত—তাতে বধূর মুখ ঢেকেচে, না প্রকাশ করচে, তা' বলা যায় না। জলে স্থলে আকাশে মিলে এখানে সন্ধ্যাবেলাকার স্বর্ণতোরণের থেকে স্বর্গীয় নহবৎ বাজতে লাগল।

পালতোলা সমুদ্রের নৌকাগুলির মত মানুষের সুন্দর সৃষ্টি অতি অল্পই আছে। যেখানে প্রকৃতির ছন্দেলয়ে মানুষকে চল্‌তে হয়েচে, সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হয়ে থাক্‌তে পারে না। নৌকাকে জল বাতাসের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েচে, এই জন্যেই জল বাতাসের শ্রীটুকু সে পেয়েচে। কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে, সেইখানেই

সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠ্‌তে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁষে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দিল, কলের চিম্‌নিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগ্‌ল, তখন দেখ্‌তে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কি কুশ্রীতাই সৃষ্টি করচে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য্য ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করচে—এম্‌নি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত করে দিচ্চে।

তোসা মারু, পিনাং বন্দর।

৬

২রা জ্যৈষ্ঠ। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র। দিনে রাত্রে আমাদের দুই চক্ষুর বরাদ্দ এর বেশি নয়। আমাদের চোখ দুটো মা-পৃথিবীর আদর পেয়ে পেটুক হয়ে গেচে। তার পাতে নানা রকমের জোগান দেওয়া চাই। তার অধিকাংশই সে স্পর্শও করে না, ফেলা যায়। কত যে নষ্ট হচ্চে বলা যায় না, দেখবার জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাণে পাই বলেই দেখবার জিনিষ সম্পূর্ণ করে' দেখি নে। এই জন্যে মাঝে মাঝে আমাদের পেটুক চোখের পক্ষে এই রকমের উপবাস ভালো।

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সাগর। অভ্যাস দোষে প্রথমটা মনে হয় এ দুটো বুঝি একেবারে শূন্য থালা। তারপর দুই একদিন লঙ্ঘনের পর ক্ষুধা একটু বাড়লেই তখন দেখ্‌তে পাই, যা' আছে তা' নেহাৎ'কম নয়। মেঘ ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হয়ে আস্‌চে, আলো ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ করে' তুল্‌চে।

আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে কাঁখে থাকি বলেই আকাশের দিকে তাকাইনে, আকাশের দিগ্‌বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ঐ আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি করে' থাক্‌তে হয়, তখন তার পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক্ হয়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলাপের মত, রূপ রঙের রাগরাগিণীর আলাপ চল্‌চে—তাল নেই, আকার আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেই সঙ্গে সমুদ্রের অপ্সর-নৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজ্‌চে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

এই বিরাট রঙ্গশালায় আকাশ এবং সমুদ্রের যে রঙ্গ, সেইটি দেখবার শক্তি ক্রমে আমাদের বেড়ে ওঠে। জগতে যা'-কিছু মহান, তার চারিদিকে একটা বিরলতা আছে, তার পট-ভূমিকা

(back ground) সাদাসিদে। সে আপনাকে দেখাবার জন্যে আর কিছুর সাহায্য নিতে চায় না। নিশীথের নক্ষত্রসভা অসীম অন্ধকারের অবকাশের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই সমুদ্র-আকাশের যে বৃহৎ প্রকাশ, সেও বহু-উপকরণের দ্বারা আপন মর্য্যাদা নষ্ট করে না। এরা হল জগতের বড় ওস্তাদ, ছলাকলায় আমাদের মন ভোলাতে এরা অবজ্ঞা করে। মনকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপন হতে অগ্রসর হয়ে এদের কাছে যেতে হয়। মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস এবং "অন্যথাবৃত্তি" হয়ে থাকে, তখন এই ওস্তাদের আলাপ তার পক্ষে অত্যন্ত ফাঁকা।

আমাদের সুবিধে হয়েছে, সামনে আমাদের আর কিছু নেই। অন্যবারে যখন বিলিতি যাত্রী-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি, তখন যাত্রীরাই ছিল এক দৃশ্য। তারা নাচে গানে খেলায় গোলেমালে অনন্তকে আচ্ছন্ন করে' রাখ্‌ত। এক মুহূর্ত্তও তারা ফাঁকা ফেলে রাখ্‌তে চাইত না। তার উপরে সাজসজ্জা, কায়দাকানুনের উপসর্গ ছিল। এখানে জাহাজের ডেকের সঙ্গে সমুদ্র আকাশের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যাত্রীর সংখ্যা অতি সামান্য, আমরাই চারজন; বাকী দু-তিন জন ধীর প্রকৃতির লোক। তারপরে ঢিলাঢালা বেশেই ঘুমচ্চি, জাগচি, খেতে যাচ্চি, কারো কোনো আপত্তি নেই; তার প্রধান কারণ, এমন কোনো মহিলা নেই, আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাঁর অসম্ভ্রম হতে পারে।

এই জন্যেই প্রতিদিন আমরা বুঝতে পারচি, জগতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোমটা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে উঠে ; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়। স্বর্গমর্ত্ত্যের এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা' আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে উঠে চলেচে, যেন সৃষ্টিকর্ত্তার আঙিনায় আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেচে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। নানা রকমের আকার ;—কেবল সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানা-ঘরের চিম্‌নিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। সোজা রেখা জড় রেখা, সে সহজেই মানুষের শাসন মানে ; সে মানুষের বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার সয়।

যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রং যে কতরকম হতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠ্‌চে, তানের উপর তান ; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি ; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন

প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেমনি। সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্তে পশ্চিম আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য্য পাগলের মত দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্চে সেও যেমন আশ্চর্য্য, পূর্ব্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য্য। প্রকৃতির হাতে অপর্য্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্য্যাপ্তও তেমনি; সূর্য্যাস্তে সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায়-আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বল্‌তে পারে তা' কেমন করে' বর্ণনা করব। সে তার জলতরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ানকে দেখায়, সমুদ্র সেই সময় তার ছোট ছোট লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ান্‌কে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্য্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র আকাশের গীতিনাট্য-লীলায় রুদ্রের প্রকাশ কিরকম দেখা গেছে, সে পূর্ব্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর এক ভঙ্গীতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠ্‌ল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চারদিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে

লাগল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জ্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সামনে জলের উপর পড়ল, জল থেকে একটা বাষ্প-রেখা সাপের মত ফোঁস করে উঠ্‌ল। আর একটা বজ্র পড়ল আমাদের সাম্‌নেকার মাস্তুলে। রুদ্র যেন স্যুইট্‌জারল্যাণ্ডের ইতিহাস-বিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মত তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগল, আমাদের স্পর্শ করল না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বিদীর্ণ হয়েচে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য্য।

৭

এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখ্‌চি, আর মনে হচ্চে অন্তরের রং ত শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্য্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ—ততটা সে সাদা। তারপরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর, সীমার রাজ্য সেই পর্য্যন্ত; তারপরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুল্‌চে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে' অভিসারে চলেচে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্ব্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্ব্বস্ব করে চুপ করে বসে থাক্‌তে পারে

না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েচে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা, পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি,—সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেচে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, "আরোর" দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা,—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন দিকে চলে, ওদিকে ত পথের চিহ্ন নেই, কিছু ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?—না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য ত নয়,—কেননা ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আস্‌চে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি, সে ত বুদ্ধিমানের চলা,—তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে চলায় মরা বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেচে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়, কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার কেবল একটি-মাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে বল্‌চে ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকচে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজ্‌চে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিরাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েচে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেচে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার মরতে মরতে সমুদ্র-পারের পথ বের করে, বারবার মরতে মরতে আকাশ-পারের ডানা মেল্‌তে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী, তারাই এগচ্চে, —ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্ব্বনাশা কালোর বাঁশি শুন্‌তে পেলে না, তারা কেবল পুঁথির নজির জড় করে কুল আঁকড়ে বসে রইল—তারা কেবল শাসন মান্‌তেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেচে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য লীলাই হচ্চে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্চে বিধি।

আবার উল্টোদিক থেকে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই, ঐ কালো অনন্ত আস্‌চেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দমূর্ত্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেই জন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে

বাজচে, অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্চে। ঐ কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখ্‌তে পারেন না,—কেননা এ যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটর জন্যে বড়র এই সাধনা যে কি অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখীর পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধরা পড়চে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের?—অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ কর্‌চেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্চেন।

এই অব্যক্ত কেবলি যদি না-মাত্র, শূন্যমাত্র হতেন,—তাহলে প্রকাশের কোনো অর্থই থাকত না, তাহলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত, তাহলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলি আরো কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুল্‌ত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন—এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুল ত্যাগ করে কেন? ঐ দিকে শূন্য নয় বলেই, ঐ দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে বলেই। সেই জন্যই উপনিষদ বলেচেন—ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই ত সৃষ্টির এই লীলা দেখ্‌চি, আলো এগিয়ে চলেচে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আস্‌চে আলোয় কূলে। আলোর মন ভুলচে কালোয়, কালোর মন ভুলেচে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উল্টে যায়। প্রকাশের একটা উল্টো পিঠ আছে, সে হচ্চে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিষ থাকাই চাই,—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্চে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উল্টো পিঠেই চোখ রাখে,—বলে সবই যাচ্চে, কিছুই থাক্‌চে না; বলে জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখ্‌চি, এ সমস্তই "না"; তাহলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো করে, ভয়ঙ্কর করে দেখে; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্চে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য কর্‌চে। আর অনন্ত রয়েচেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মত চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্চে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ কর্‌তে পারচে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই—আর যিনি কেবলমাত্র আছেন, তিনি স্থির, ঐ প্রলয়রূপিনী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই, এখানে যোগের অর্থ হচ্চে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার কর্‌বার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যবসা করচে। সে লোক করচে কি ?—তার মূলধনকে, অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে, সে মুনফা, অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করচে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে' না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেচে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে, কিন্তু তার বাঁশি বাজচে,—সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে বণিক সেই বাঁশি শোনে, সে আপন ব্যাঙ্কে জমানো কোম্পানি-কাগজের কূল ত্যাগ করে', সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কি দেখ্‌চি ?—না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্চে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্চে।

কিন্তু মনে করা যাক্‌, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায় ঐ খরচের দিকের হিসাবটাই দেখ্‌চে। বণিক কেবলি আপনার পাওয়া-টাকা খরচ করেই চলেছে, তার অন্ত নেই। তার গা শিউরে ওঠে! সে বলে, এই ত প্রলয়! খরচের হিসাবের কালো অঙ্কগুলো রক্তলোলুপ রসনা দুলিয়ে কেবলি যে নৃত্য করচে। যা খরচ,—অর্থাৎ বস্তুত যা নেই,—তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধরে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই চলেচে। ঐকেই ত বলে মায়া। বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া-অঙ্কটির চিরদীর্ঘায়মান শৃঙ্খল কাটাতে পারচে না। এস্থলে

মুক্তিটা কি ?—না, ঐ সচল অঙ্কগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্ব্বিকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ থাকার দরুণ মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা করে' মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু মানুষ তাকে দেখ্‌তে পায় না। তাই বলে—

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

চীন সমুদ্র
তোসা-মারু
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

৮

শুনেছিলুম, পারস্যের রাজা যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন হাতে-খাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজকে বলেছিলেন, কাঁটাচামচে দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও। যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই খাবারের সঙ্গে কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। আঙুলের ডগা দিয়েই স্বাদ-গ্রহণের সুরু।

আমার তেমনি জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ সুরু হয়েচে। যদি ফরাসী জাহাজে করে জাপানে যেতুম, তাহলে আঙুলের ডগা দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হত না।

এর আগে অনেকবার বিলিতি জাহাজে করে সমুদ্র যাত্রা করেচি—তার সঙ্গে এই জাহাজের বিস্তর তফাৎ। সে সব জাহাজের কাপ্তেন ঘোরতর কাপ্তেন। যাত্রীদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হাসি তামাসা যে তার বন্ধ—তা নয়; কিন্তু কাপ্তেনীটা খুব টক্‌টকে রাঙা। এত জাহাজে আমি ঘুরেচি, তার মধ্যে কোনো কাপ্তেনকেই আমার মনে পড়ে না। কেননা তারা কেবলমাত্র জাহাজের অঙ্গ। জাহাজ-চালানোর মাঝখান দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।

হতে পারে আমি যদি য়ুরোপীয় হতুম, তাহলে তারা যে কাপ্তেন ছাড়াও আর কিছু—তারা যে মানুষ—এটা আমার অনুভব কর্‌তে বিশেষ বাধা হত না। কিন্তু এ জাহাজেও আমি বিদেশী,—একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা, একজন জাপানীর পক্ষেও আমি তাই।

এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের কাপ্তেনীটা কিছুমাত্র লক্ষ্যগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ। যাঁরা তাঁর নিম্নতর কর্ম্মচারী, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্ম্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড়ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি,—দিব্যি সহজ ভাব। কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েচে,

সে কাপ্তেন-হিসাবে নয়, মানুষ-হিসাবে। এ যাত্রা আমাদের শেষ হয়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে জাহাজ-চলার সম্বন্ধ আমাদের ঘুচে যাবে, কিন্তু তাঁকে আমাদের মনে থাকবে।

আমাদের ক্যাবিনের যে ষ্টুয়ার্ড আছে, সেও দেখি তার কাজকর্ম্মের সীমাটুকুর মধ্যেই শক্ত হয়ে থাকে না। আমরা আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কচ্চি, তার মাঝখানে এসে সেও ভাঙা ইংরাজিতে যোগ দিতে বাধা বোধ করে না। মুকুল ছবি আঁকচে, সে এসে খাতা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ছবি আঁকতে লেগে গেল।

আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি, তিনি একদিন এসে আমাকে বল্লেন,—আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার করতে ইচ্ছে করি; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে কর, তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমত সংক্ষেপে তু'চার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।—তারপর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কি, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর চল্‌চে।

অন্য কোন জাহাজের খাজাঞ্চি এই সব প্রশ্ন নিয়ে যে মাথা বকায়, কিম্বা নিজের কাজকর্ম্মের মাঝখানে এরকম উপসর্গের সৃষ্টি করে, এরকম আমি মনে কর্‌তে পারিনে। এদের দেখে আমার মনে হয় এরা নূতন-জাগ্রত জাতি,—এরা সমস্তই নূতন

করে জানতে, নূতন করে ভাবতে উৎসুক। ছেলেরা নতুন জিনিষ দেখ্‌লে যেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে, আইডিয়া সম্বন্ধে এদের যেন সেইরকম ভাব।

তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্ব এই যে, একপক্ষে জাহাজের যাত্রী, আর এক পক্ষে জাহাজের কর্ম্মচারী, এর মাঝখানকার গণ্ডিটা তেমন শক্ত নয়। আমি যে এই খাজাঞ্চির প্রশ্নের উত্তর লিখ্‌তে বসব, এ কথা মনে কর্‌তে তার কিছু বাধেনি,—আমি দুটো কথা শুনতে চাই, তুমি দুটো কথা বল্‌বে; এতে বিঘ্ন কি আছে? মানুষের উপর মানুষের যে একটি দাবী আছে, সেই দাবীটা সরলভাবে উপস্থিত করলে মনের মধ্যে আপনি সাড়া দেয়, তাই আমি খুসি হয়ে আমার সাধ্যমত এই আলোচনায় যোগ দিয়েচি।

আর একটা জিনিষ আমার বিশেষ করে চোখে লাগ্‌চে। মুকুল বালকমাত্র, সে ডেকের প্যাসেঞ্জার। কিন্তু জাহাজের কর্ম্মচারীরা তার সঙ্গে অবাধে বন্ধুত্ব কর্‌চে। কি করে জাহাজ চালায়, কি করে সমুদ্রে পথ নির্ণয় করে, কি করে গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে হয়, কাজ কর্‌তে কর্‌তে তারা এই সমস্ত তাকে বোঝায়। তা ছাড়া নিজেদের কাজকর্ম্ম আশাভরসার কথাও ওর সঙ্গে হয়। মুকুলের সখ গেল, জাহাজের এঞ্জিনের ব্যাপার দেখ্‌বে। ওকে কাল রাত্রি এগারোটার সময় জাহাজের পাতালপুরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে, এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেখিয়ে আন্‌লে।

কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ—এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বদেশের জিনিষ। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানব-সম্বন্ধের দাবী ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম জাপান ত য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেচে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু এই জাপানী জাহাজে কাজ দেখতে পাচ্চি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্চিনে। মনে হচ্চে যেন আপনার বাড়ীতে আছি—কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ ধোওয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্ম্মের কোন খুঁৎ নেই।

প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্ব্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের অত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবী মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেই জন্যে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয়, আত্মীয়তার দাবী করে। সেই জন্যে যেখানে আমাদের কোনো দাবী চলেনা, যেখানে কাজ অত্যন্ত খাড়া, সেখানে আমাদের প্রকৃতি কষ্ট পায়। অনেক সময়ে ইংরেজ মনিবের সঙ্গে বাঙালী কর্ম্মচারীর যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটে, তার কারণ এই,—ইংরেজি কর্ত্তা বাঙালী কর্ম্মচারীর দাবী বুঝতে পারে না, বাঙালী কর্ম্মচারী ইংরেজ কর্ত্তার কাজের কড়া শাসন বুঝতে পারে না। কর্ম্মশালার কর্ত্তা যে কেবলমাত্র কর্ত্তা হবে, তা

নয়—মা বাপ হবে, বাঙালী কর্ম্মচারী চিরকালের অভ্যাস বশত এইটে প্রত্যাশা করে; যখন বাধা পায় তখন আশ্চর্য্য হয়, এবং মনে মনে মনিবকে দোষ না দিয়ে থাকতে পারে না। ইংরেজ কাজের দাবীকে মানতে অভ্যস্ত, বাঙালী মানুষের দাবীকে মানতে অভ্যস্ত,—এই জন্যে উভয়পক্ষে ঠিকমত মিটমাট হতে চায় না।

কিন্তু কাজের সম্বন্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ, এ দুইয়ের বিচ্ছেদ না হয়ে সামঞ্জস্য হওয়াটাই দরকার, এ কথা না মনে করে থাকা যায় না। কেমন করে সামঞ্জস্য হতে পারে, বাইরে থেকে তার কোনো বাঁধা নিয়ম ঠিক করে দেওয়া যায় না। সত্যকার সামঞ্জস্য প্রকৃতির ভিতর থেকে ঘটে। আমাদের দেশে প্রকৃতির এই ভিতরকার সামঞ্জস্য ঘটে ওঠা কঠিন কেননা যাঁরা আমাদের কাজের কর্ত্তা, তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আমরা কাজ চালাতে বাধ্য।

জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেচে, কিন্তু কাজের কর্ত্তা তারা নিজেই। এই জন্যে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয় ত পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্যভাবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে। যদি সেটা ঘটে, তবে সেইটেই পূর্ণতার আদর্শ হবে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অনুকরণের ঝাঁজটা যখন কড়া থাকে, তখন বিধিবিধান সম্বন্ধে ছাত্র গুরুর চেয়ে আরো কড়া হয়; কিন্তু ভিতরকার প্রকৃতি আস্তে আস্তে আপনার কাজ করতে থাকে, এবং শিক্ষার

কড়া অংশগুলোকে নিজের জারক রসে গলিয়ে আপন করে নেয়। এই জীর্ণ করে নেওয়ার কাজটা একটু সময়সাধ্য। এই জন্যেই পশ্চিমের শিক্ষা জাপানে কি আকার ধারণ করবে, সেটা স্পস্ট করে দেখবার সময় এখনো হয় নি। সম্ভবত এখন আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখতে পাব, যেটা কুশ্রী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির কাজই হচ্চে অসামঞ্জস্যগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চলচে সন্দেহ নেই। অন্ততঃ এই জাহাজ টুকুর মধ্যে আমি ত এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্ন দেখতে পাচ্চি।

৯

২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পৌঁচিল। অনতিকাল পরেই একজন জাপানী যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তিনি এখানকার একটি জাপানী কাগজের সম্পাদক। তিনি আমাকে বল্লেন, তাঁদের জাপানের সব চেয়ে বড় দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা তার পেয়েচেন যে আমি জাপানে যাচ্চি, সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্তৃতা আদায় করবার জন্যে অনুরোধ করেচেন। আমি বল্লুম, জাপানে না পৌঁছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না। তখনকার মত এই টুকুতেই মিটে গেল। আমাদের

যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে গেলেন। জাহাজ একেবারে ঘাটে লেগেচে। এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্রী বিভীষিকা আর নেই—এরি মধ্যে ঘন মেঘ করে বাদলা দেখা দিলে। বিকট গড়ঘড় শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চল্‌তে লাগ্‌ল। আমি কুঁড়ে মানুষ, কোমর বেঁধে সহর দেখ্‌তে বেরনো আমার ধাতে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক্‌-এ বসে মনকে কোনোমতে শান্ত করে রাখবার জন্যে লিখ্‌তে বসে গেলুম।

খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানী মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি লেখা বন্ধ করে একটি ইংরাজি-বেশ-পরা জাপানী মহিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। তিনিও সেই জাপানী সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে, বক্তৃতা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন। আমি বহু কষ্টে সে অনুরোধ কাটালুম। তখন তিনি বল্লেন, আপনি যদি একটু সহর বেড়িয়ে আস্‌তে ইচ্ছা করেন ত আপনাকে সব দেখিয়ে আনতে পারি। তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জাঁতার মত পিষ্‌ছিল, কোথাও পালাতে পারলে বাঁচি,—সুতরাং আমাকে বেশী পীড়াপীড়ি করতে হল না। সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে করে, সহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উঁচু নীচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম। জমি ঢেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের স্রোত কল্‌কল্‌ করে এঁকে বেঁকে

ছুটে চলেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাঁধা কাটা বেত ভিজ্‌চে। রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ী। পথে ঘাটে চীনেই বেশী— এখানকার সকল কাজেই তারা আছে।

গাড়ি সহরের মধ্যে যখন এল, মহিলাটি তাঁর জাপানী জিনিষের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, মনে মনে ভাবচি জাহাজে আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার খাবার সময় হয়ে এল ; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা তোলপাড় কর্‌চে কল্পনা করে, কোন মতেই ফির্‌তে মন লাগ্‌ছিল না। মহিলাটি একটি ছোট ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও আমার সঙ্গী ইংরাজটিকে থালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ করলেন। ফল খাওয়া হলে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ করলেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হোটেলে খাইয়ে আন্‌তে ইচ্ছা করেন। তাঁর এ অনুরোধও আমরা লঙ্ঘন করি নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এঁর স্বামী জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসায় যথেষ্ট লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন হয়ে উঠ্‌ছিল। স্ত্রীই স্বামীকে প্রস্তাব করলেন, এস আমরা একটা কিছু ব্যবসা করি। স্বামী প্রথমে তাতে নারাজ ছিলেন। তিনি বল্লেন, আমাদের বংশে ব্যবসা ত কেউ করে নি, ওটা আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ। শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে

রাজি হয়ে, জাপান থেকে দুজনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুল্‌লেন। সে আজ আঠারো বৎসর হল। আত্মীয়বন্ধু সকলেই একবাক্যে বল্লে, এইবার এরা মজ্‌ল। এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার-কুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হতে লাগ্‌ল। গত বৎসরে এঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েচে—এখন এঁকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হচ্চে।

বস্তুত এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে কথা বল্‌ছিলুম, এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখ্‌তে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ—এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় পেয়েছি। তারপরে কর্ম্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ কর্‌তে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে, যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্চে কর্ম্মপরতা। কর্ম্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য কর্‌তে পারে, তা নয়—তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এই জন্যে, যে সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না, সে সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভাল করে কর্‌তে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার করেচে, সেখানে স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার পড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েচে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে;

শুনেছি ফ্রান্সের মেয়েরাও ব্যবসায়ে আপনাদের কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েচে। যে সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে সব কাজে পটুতা, পরিশ্রম, ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব চেয়ে দরকার, সে সব কাজ মেয়েদের।

ওরা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়লে। ঠিক এই ছাড়বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে পড়ে' গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, ঐ বিড়ালকে বাঁচানই প্রধান কাজ হয়ে উঠ্‌ল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দ্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড় আনন্দ দিয়েচে।

চীন সমুদ্র
তোসা-মারু জাহাজ
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

১০

সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেচে, পালের নৌকার মত। সে নৌকা কোনো ঘাটে যাবার নৌকা নয়, তাতে কোনো বোঝাই নেই। কেবলমাত্র ঢেউয়ের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করতে তারা বেরিয়েচে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবী মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের

নিমন্ত্রণ আর রাখ্‌তে পারিনে। চাঁদ যেমন তার একটা মুখ সূর্য্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেচে, তার আর একটা মুখ অন্ধকার—তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটা-তেই চেতনার সমস্ত আলো খেলচে, অন্য একটা এদিক আমরা ভুলেই গেচি ; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি, সে আমাদের খেয়া-লেই আসে না।

সত্যকে যেদিকে ভুলি, কেবল যে সেই দিকেই লোকসান, তা নয়—সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে, তার লোকসানের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেই জন্যেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উল্টোদিকে টান আসে। সে বলে "বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে বলে বসে, সংসার কারাগার ; মুক্তি খুঁজতে শান্তি খুঁজতে সে বনে, পর্ব্বতে, সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েচে বলেই, বড় করে প্রাণের নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এত বড় অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বল্‌তে হয়েচে,—মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।

লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি, অবকাশ জিনিষটাকে তখন ডরাই। কেননা লোকালয় জিনিষটা একটা নিরেট জিনিষ, তার মধ্যে ফাঁক মাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকাটাকে কোন মতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই, তাস পাশা চাই, রাজা-উজির

মারা চাই—নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাইনে, সময়টাকে আমরা বাদ দিতে চাই।

কিন্তু অবকাশ হচ্চে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে, অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়,—একেবারে পরিপূর্ণ। সংসারের মধ্যে যেখানে বৃহৎকে আমরা রাখিনি, সেখানে অবকাশ এমন ফাঁকা; বিশ্বে যেখানে বৃহৎ বিরাজমান, সেখানে অবকাশ এমন গভীরভাবে মনোহর। গায়ে কাপড় না থাক্‌লে মানুষের যেমন লজ্জা সংসারে অবকাশ আমাদের তেমনি লজ্জা দেয়, কেননা, ওটা কিনা শূন্য, তাই ওকে আমরা বলি জড়তা, আলস্য;—কিন্তু সত্যকার সন্ন্যাসীর পক্ষে অবকাশে লজ্জা নেই, কেননা তার অবকাশ পূর্ণতা,—সেখানে উলঙ্গতা নেই।

এ কেমনতর—যেমন প্রবন্ধ এবং গান। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে, সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে, সেখানে সুরে ভরাট। বস্তুত সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশী থাকা চাই। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে!

আমরা লোকালয়ের মানুষ এই যে জাহাজে করে চলচি, এইবার আমরা কিছুদিনের জন্যে বিশ্বের দিকে মুখ ফেরাতে পেরেচি। সৃষ্টির যে-পিঠে অনেকের ঠেলাঠেলি ভিড়, সেদিক থেকে যে-পিঠে একের আসন, সেদিকে এসেচি। দেখতে

পাচ্চি, এই যে নীল আকাশ এবং নীল সমুদ্রের বিপুল অবকাশ —এ যেন অমৃতের পূর্ণ ঘট।

অমৃত,—সে যে শুভ্র আলোর মত পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেচে, অমৃতরসে তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এই জন্যে, অনেককে সত্য করে জান্‌তে চলে, সেই একেকে সঙ্গে সঙ্গে জান্‌তে হয়। গাছ থেকে যে ডাল কাটা হয়েচে, সে ডালের ভার মানুষকে বইতে হয়, গাছে যে ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক, তারই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা,—একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক, সেই ত মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

সংসারে একদিকে আবশ্যকের ভিড়, অন্যদিকে অনাবশ্যকের। আবশ্যকের দায় আমাদের বহন করতেই হবে, তাতে আপত্তি করলে চল্‌বে না। যেমন ঘরে থাক্‌তে হলে দেয়াল না হলে চলে না,—এও তেমনি। কিন্তু সবটাই ত দেয়াল নয়। অন্তত খানিকটা করে জানালা থাকে—সেই ফাঁক দিয়ে আমরা আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি। কিন্তু সংসারে দেখ্‌তে পাই লোকে ঐ জানালাটুকু সইতে পারে না। ঐ ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবার জন্যে যতরকম সাংসারিক অনাবশ্যকের সৃষ্টি। ঐ জানলাটার উপর বাজে কাজ, বাজে চিঠি, বাজে সভা, বাজে বক্তৃতা, বাজে হাঁস্‌ফাঁস্ মেরে দিয়ে, দশে মিলে ঐ ফাঁকটাকে

একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়। নারকেলের ছিব্‌ড়ের মত, এই অনাবশ্যকের পরিমাণটাই বেশী। ঘরে, বাইরে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আমোদে, আহ্লাদে, সকল বিষয়েই এরই অধিকার সব চেয়ে বড়—এর কাজই হচ্চে ফাঁক বুজিয়ে বেড়ানো।

কিন্তু কথা ছিল ফাঁক বোজাব না, কেননা ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছাড়া পূর্ণকে পাওয়া যায় না। ফাঁকের ভিতর দিয়েই আলো আসে, হাওয়া আসে। কিন্তু আলো হাওয়া আকাশ যে মানুষের তৈরি জিনিষ নয়, তাই লোকালয় পারৎপক্ষে তাদের জন্যে জায়গা রাখতে চায় না—তাই আবশ্যক বাদে যেটুকু নিরালা থাকে, সেটুকু অনাবশ্যক দিয়ে ঠেসে ভর্ত্তি করে দেয়। এম্‌নি করে মানুষ আপনার দিনগুলোকে ত নিরেট করে তুলেইচে, রাত্রিটাকেও যতখানি পারে ভরাট করে দেয়। ঠিক যেন কলকাতার ম্যুনিসিপালিটির আইন। যেখানে যত পুকুর আছে বুজিয়ে ফেল্‌তে হবে,—রাবিশ দিয়ে হোক্, যেমন করে হোক্। এমন কি, গঙ্গাকেও যতখানি পারা যায় পুল-চাপা, জেটি-চাপা, জাহাজ-চাপা দিয়ে গলা টিপে মারবার চেষ্টা। ছেলেবেলাকার কল্‌কাতা মনে পড়ে, ঐ পুকুরগুলোই ছিল আকাশের স্যাঙাৎ, সহরের মধ্যে ঐখানটাতে দ্যুলোক এই ভূলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত, ঐখানেই আকাশের আলোকের আতিথ্য কর্‌বার জন্য পৃথিবী আপন জলের আসনগুলি পেতে রেখেছিল।

আবশ্যকের একটা সুবিধা এই যে, তার একটা সীমা আছে। সে সম্পূর্ণ বেতালা হতে পারে না, সে দশটা-চারটেকে স্বীকার

করে, তার পার্ব্বণের ছুটি আছে, সে রবিবারকে মানে, পারৎপক্ষে রাত্রিকে সে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ দিয়ে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় না। কেননা, সে যেটুকু সময় নেয়, আয়ু দিয়ে অর্থ দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়—সহজে কেউ তার অপব্যয় করতে পারে না। কিন্তু অনাবশ্যকের তালমানের বোধ নেই, সে সময়কে উড়িয়ে দেয়, অসময়কে টিঁক্‌তে দেয় না। সে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকে, খিড়কির রাস্তা দিয়ে ঢোকে আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে কাজের সময় দরজায় ঘা মারে, ছুটির সময় হুড়্‌মুড়্ করে আসে, রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার কাজ নেই বলেই তার ব্যস্ততা আরো বেশী।

আবশ্যক কাজের পরিমাণ আছে, অনাবশ্যক কাজের পরিমাণ নেই—এইজন্যে অপরিমেয়ের আসনটি ঐ লক্ষ্মীছাড়াই জুড়ে বসে, ওকে ঠেলে ওঠানো দায় হয়। তখনই মনে হয় দেশ ছেড়ে পালাই, সন্ন্যাসী হয়ে বেরই, সংসারে আর টেকা যায় না!

যাক্, যেমনি বেরিয়ে পড়েচি, অমনি বুঝতে পেরেচি বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দের সম্বন্ধ, সেটাকে দিনরাত অস্বীকার করে কোনো বাহাদুরি নেই। এই যে ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি নেই, অথচ সমস্ত কানায় কানায় ভরা, এইখানকার দর্পণটিতে যেন নিজের মুখের ছায়া দেখ্‌তে পেলুম। "আমি আছি" এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘরবাড়ীর মধ্যে ভারি ভেঙে চুরে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর, আকাশের উপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখ্‌লে তবে তার মানে

বুঝতে পারি—তখন আবশ্যককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যককে পেরিয়ে আনন্দলোকে তার অভ্যর্থনা দেখ্‌তে পাই,—তখন স্পষ্ট করে বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে আহ্বান করে-ছিলেন।

১১

সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকং-এর ঘাট পর্য্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসচি! সে যে কি প্রকাণ্ড, এমন করে তাকে চোখে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না—শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার। কবি-কঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে,—সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিলচে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট,—এও সেই রকম। এই বাণিজ্যব্যাধটাও হাঁসফাঁস কর্‌তে কর্‌তে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পূরচে, সে দেখে ভয় হয়—তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কি! লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলচে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্চে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম কর্‌চে, এবং লোহার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্ব্বত্র সোনার রক্ত-স্রোত চালান করে দিচ্চে।

এ'কে দেখে মনে হয় যে এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলোর মত। কেবলমাত্র তার ল্যাজের

আয়তন দেখ্‌লেই শরীর আঁৎকে ওঠে। তারপরে সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখী হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি,—সে খানিকটা সরীসৃপের মত, খানিকটা বাদুড়ের মত, খানিকটা গণ্ডারের মত। অঙ্গসৌষ্ঠব বল্‌তে যা বোঝায়, তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ঙ্কর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে, সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ ল্যাজটা যখন নড়্‌তে থাকে, তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তারপরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করবার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র থাবা থাবা জিনিষ খাচ্চে তা নয়, সে মানুষ খাচ্চে, স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু জগতের সেই প্রথম যুগের দানব জন্তুগুলো টিক্‌ল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিষটা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁসফাঁসটা যখন অত্যন্ত বেশী চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখিনে,—তখন বেশ বুঝতে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে, একদিন

তাকে তার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা কখনই কদর্য্য অমিতাচারকে অধিক দিন সইতে পারে না—তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে! বাণিজ্য-দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করচে। একদিন আসচে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ব-বিদরা এই সর্ব্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য্য নিয়ে নয়! মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয় শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশী নয়। কিন্তু সে এমন একটি বল পেয়েচে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা কোনো স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করচে। মানুষের মধ্যে দেহ পরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেচে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে—তার মানেই হচ্চে নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে; সে যত কম আঘাত দেয়, ততই সে জয়ী হয়; সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্য-দানবকেও একদিন তার দানবলীলা সম্বরণ করে মানব হতে হবে! আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় ত একেবারেই নেই, সেইজন্যে পৃথিবীতে ও কেবল আপনার

ভার বাড়িয়ে চলেচে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিতে চাচ্চে। কিন্তু একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোট, তার কর্ম্মপ্রণালী সহজ; মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্য্যবোধকে, ধর্ম্মবুদ্ধিকে সে মানে; সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্য্যভাবে লুব্ধ নয়, তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত করে বড় নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি করে বড়। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী, আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করচে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির করচে, আপন আবর্জ্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করচে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করচে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ,—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং মানব-হৃদয়ের বিরুদ্ধে,—এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করচেই, তার সন্দেহ নেই। মুনফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেচে, সে কখনই চলবে না!

৯ই জ্যৈষ্ঠ। মেঘ বৃষ্টি, বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে—হংকং বন্দরে পাহাড়গুলো দেখা দিয়েচে তাদের

গা বেয়ে বেয়ে ঝরনা ঝরে পড়েচে। মনে হচ্চে দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেচে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরচে! এণ্ড্রুজ সাহেব বল্‌চেন দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কটল্যাণ্ডের হ্রদের মত, তেমনিতর ঘন সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেম্‌নিতর ভিজে কম্বলের মত আকাশের মেঘ, তেম্‌নিতর কুয়াসার ন্যাতা বুলিয়ে অল্প অল্প মুছে-ফেলা জলস্থলের মূর্ত্তি। কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েচে—কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন করে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেচি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ কর্‌বার চেষ্টা না করে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। একধারে দাঁড়িয়ে ঐ বাদ্‌লার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম "শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে।" এমনি করে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম,—বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম,—কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্ত্ত্যবাসীকেই হার মান্‌তে হল। আমি অত দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক না, বায়ুবলে আকাশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন?

কাল রাত্রেই জাহাজের বন্দরে পৌঁছিবার কথা ছিল, কিন্তু এইখানটায় সমুদ্রবাহী জলের স্রোত প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, এবং বাতাসও বিরুদ্ধ ছিল তাই পদে পদে দেরি হতে লাগল।

জায়গাটাও সঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কটময়। কাপ্তেন সমস্ত রাত জাহাজের উপরতলায় গিয়ে সাবধানে পথের হিসাব করে চলেচেন। আজ সকালেও মেঘবৃষ্টির বিরাম নেই। সূর্য দেখা দিল না, তাই পথ ঠিক করা কঠিন। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌চে, এঞ্জিন থেমে যাচ্চে, নাবিকের দ্বিধা স্পষ্ট বুঝা যাচ্চে। আজ সকালে আহারের টেবিলে কাপ্তেনকে দেখা গেল না। কাল রাত দুপুরের সময় কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি পরে নেমে এসে আমাকে বলে গেলেন, ডেকের কোনো দিকেই শোবার সুবিধা হবে না, কেননা বাতাসের বদল হচ্চে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার দেখে আমার মনে বড় আনন্দ হয়েছিল। জাহাজের উপর থেকে একটা দড়িবাঁধা চামড়ার চোঙে করে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তোলা হয়। কাল বিকেলে এক সময়ে মুকুলের হঠাৎ জানতে ইচ্ছা হল, এর কারণটা কি? সে তখনি উপরতলায় উঠে গেল। এই উপর তলাতেই জাহাজের হালের চাকা, এবং এখানেই পথনির্ণয়ের সমস্ত যন্ত্র। এখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। মুকুল যখন গেল, তখন তৃতীয় অফিসার কাজে নিযুক্ত। মুকুল তাকে প্রশ্ন করতেই, তিনি ওকে বোঝাতে সুরু করলেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি স্রোতের ধারা বইচে, তাদের উত্তাপের পরিমাণ স্বতন্ত্র। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তুলে তাপমান দিয়ে পরীক্ষা করে সেই ধারাপথ নির্ণয় করা দরকার। সেই ধারার ম্যাপ বের করে তাদের গতিবেগের সঙ্গে জাহাজের গতিবেগের কি

রকম কাটাকাটি হচ্চে, তাই তিনি মুকুলকে বোঝাতে লাগ্‌লেন। তাতেও যখন সুবিধা হল না, তখন বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরল করে দিলেন।

বিলিতি জাহাজে মুকুলের মত বালকের পক্ষে এটা কোনো-মতেই সম্ভবপর হত না। সেখানে ওকে অত্যন্ত সোজা করেই বুঝিয়ে দিত যে, ও জায়গায় তার নিষেধ। মোটের উপরে জাপানী অফিসরের সৌজন্য, কাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি, এই জাপানী জাহাজে কাজের নিয়মের ফাঁক দিয়ে মানুষের গতিবিধি আছে। অথচ নিয়মটা চাপা পড়ে যায় নি, তাও বারবার দেখেচি। জাহাজ যখন বন্দরে স্থির ছিল, যখন উপরতলার কাজ বন্ধ, তখন সেখানে বসে কাজ কর্‌বার জন্যে আমি কাপ্তেনের সম্মতি পেয়েছিলুম। সেদিন পিয়ার্সন সাহেব দুজন ইংরেজ আলাপীকে জাহাজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডেকের উপর মাল তোলার শব্দে আমাদের প্রস্তাব উঠল, উপরের তলায় যাওয়া যাক। আমি সম্মতির জন্য প্রধান অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলুম,—তিনি তখনি বল্লেন, "না"। নিয়ে গেলে কাজের ক্ষতি হত না, কেননা কাজ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের একটা সীমা আছে, সে সীমা বন্ধুর পক্ষে যেখানে, অপরিচিতের পক্ষে সেখানে না। উপরের তলা ব্যবহারের সম্মতিতেও আমি যেমন খুসি হয়েছিলুম, তার বাধাতেও তেমনি খুসি হলুম। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, এর মধ্যে দাক্ষিণ্য আছে, কিন্তু দুর্ব্বলতা নেই।

বন্দরে পৌঁছবামাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি অভ্যর্থনার টেলিগ্রাম ও পত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান অফিসার এসে আমাকে বল্লেন, এ যাত্রায় আমাদের সাঙ্হাই যাওয়া হল না; একেবারে এখান থেকে জাপান যাওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কেন? তিনি বল্লেন, জাপানবাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েচে, তাই আমাদের সদর আফিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেচে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না করে চলে যেতে। সাঙ্হাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এই-খানেই নামিয়ে দেব—অন্য জাহাজে করে সেখানে যাবে।

এই খবরটি আমার পক্ষে যতই গৌরবজনক হোক, এখানে লেখবার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার লেখবার কারণ হচ্চে এই যে, এই ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব আছে, সেটা আলোচ্য। সেটা পুনশ্চ ঐ একই কথা। অর্থাৎ ব্যবসার দাবী সচরাচর যে-পাথরের পাঁচিল খাড়া করে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানব সম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাক্‌বে। সেই দু'দিনের জন্যে সহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মত কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভাল; আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়াস্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার করেও, জাহাজে রয়ে গেলুম। সে জন্যে আমার যে বক্‌শিস্ মেলেনি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা-মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলি ঢেউ খেলাচ্চে। এরা বড় বড় বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করচে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোন দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সঙ্গীতের মত বেজে উঠ্‌চে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, একথা আমি পূর্ব্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড় সুন্দর; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর কর্‌তে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সাম্‌নে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বল্‌তে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোন স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না,—কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁৎ সঙ্গতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সাম্‌নেই আর একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্ম্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান করছিল,—মানুষের শরীরের যে কি

স্বর্গীয় শোভা, তা আমি এমন করে আর কোনদিন দেখতে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূত ভাবে একত্র দেখতে পেয়ে, আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্চে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ কর্‌বার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্চে। যে-সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার কর্‌বার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোন অংশে ফাঁকি দেয় না,—সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ কর্‌তে শিখেচে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্চে;—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেচে—কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিত্‌তে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়।

এই এতবড় একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে? তখন তার কর্ম্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ কর্‌চে, তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু যে জাতির যে দিকে যতখানি বড় হবার

শক্তি আছে, সে দিকে তাকে ততখানি বড় হয়ে উঠ্‌তে দিতে বাধা-দেওয়া যে স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে, তার মত এমন সর্ব্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই। এমন বর্ব্বর-জাতির কথা শোনা যায়, যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়,—আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশী ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে-জাতি দেশকে-দেশ দাবী করে।

আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস করচে এবং কাজ করচে। কাজের এই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগল। কাজের এই মূর্ত্তিই চরম মূর্ত্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়,—বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘরকন্না, স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস করে চল্‌তে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাস-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তোলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন কর্‌তে থাকে, তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে, সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখ্‌তে পাব? সেখানে মানুষ আপনার বারোআনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্চে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলি বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না;—এমন বিপুল

জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারিদিকে কেবলি জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচার-ধর্ম্মের সঙ্গে কাল ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব।

চীন সমুদ্র
তোসা মারু জাহাজ

১২

১৬ জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের "কোবে" বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টিবাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোট ছোট দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্র যাত্রীদের ইসারা করচে—কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপসা;—বাদ্‌লার হাওয়ায় সর্দ্দিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে কণ্ঠে আওয়াজ যেরকম হয়ে থাকে, ঐ দ্বীপগুলোর সেইরকম ঘোরতর সর্দ্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাঁট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে, ডেকের এধার থেকে ওধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানী যাত্রী দেশে ফিরচেন, তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেচেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্যে। তখন কেবল একটি মাত্র ছোট নীলাভ পাহাড় মানসসরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মত জলের উপরে জেগে রয়েচে। তিনি স্থির নেত্রে এইটুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন,

তাঁর সেই চোখে ঐ পাহাড় টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখচি নূতনকে, তিনি দেখ্‌চেন তাঁর চিরন্তনকে ; আমরা অনেক্‌ তুচ্ছকে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখচি, তিনি ছোট বড় সমস্তকেই তাঁর এক বিরাটের অঙ্গ করে দেখ্‌চেন,—এই জন্যেই ছোটও তাঁর কাছে বড়, ভাঙাও তাঁর কাছে জোড়া ; অনেক তাঁর কাছে এক। এই দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্য উঠেচে। বড় বড় জাপানী অপ্সরা নৌকা, আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্য্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েচে, সেইখানে নৃত্য কর্‌চে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েচে,—ভাবলুম এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে বসে, সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভাল করে দেখে নিই।

কিন্তু সে কি হবার জো আছে ? নিজের নামের উপমা গ্রহণ কর্‌তে যদি কোনো অপরাধ না থাকে, তাহলে বলি আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েচেন, তখন আমার পালা আরম্ভ হল। আমার চারিদিকে একটু কোথাও ফাঁক দেখ্‌তে পেলুম না। খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

কোবে সহরে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিক আছেন, তার মধ্যে বাঙালীর ছিটেফোঁটাও কিছু পাওয়া যায়। আমি হংকং সহরে পৌঁছেই এই ভারতবাসীদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম,

তাঁরাই আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করেচেন। তাঁরা জাহাজে গিয়ে আমাকে ধরলেন। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর টাইক্কন এসে উপস্থিত। ইনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। কাট্‌সুটাকেও দেখা গেল, ইনিও আমাদের চিত্রকর বন্ধু। সেই সঙ্গে সানো এসে উপস্থিত,—ইনি এককালে আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে কাওয়াগুচিরও দর্শন পাওয়া গেল। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আমাদের নিজের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখতে পেলুম সেই ভাবনার ভার অনেকে মিলে যখন গ্রহণ করেন, তখন ভাবনার অন্ত থাকে না। আমাদের প্রয়োজন অল্প, কিন্তু আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে উঠ্‌ল। জাপানী পক্ষ থেকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে টানাটানি করতে লাগ্‌লেন—কিন্তু ভারতবাসীর আমন্ত্রণ আমি পূর্ব্বেই গ্রহণ করেচি। এই নিয়ে বিষম একটা সঙ্কট উপস্থিত হল। কোনো পক্ষই হার মানতে চান না। বাদ বিতণ্ডা বচসা চল্‌তে লাগল। আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের চরের দল আমার চারিদিকে পাক-খেয়ে বেড়াতে লাগল। দেশ ছাড়বার মুখে বঙ্গসাগরে পেয়েছিলুম বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন! দুটোর মধ্যে যদি বাছাই করতেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিষের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার

দরকার কেবলমাত্র সেইটুকু গ্রহণ করেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশী নিতে হয়; সেই বেশীটুকুর বোঝা বিষম বোঝা। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মধ্যে কোনটা যে ফসলের পক্ষে বেশী মুস্কিল জানিনে।

এখানকার একজন প্রধান গুজরাটি বণিক মোরারজি— তাঁরই বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েচি। সেই সব খবরের কাগজের অনুচররা এখানে এসেও উপস্থিত।

এই উৎপাতটা আশা করিনি। জাপান যে নতুন মদ পান করেচে, এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তারই একটা অঙ্গ। এত ফেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিষটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদ্বুদপুঞ্জ;—এতে কারো সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝিনে;—এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতায় ভর্ত্তি করে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সামনে প্রকাশ করে। এই মাৎলামিটাই আমাকে সব চেয়ে পীড়া দেয়। যাক্‌গে।

মোরারজির বাড়ীতে আহারে আলাপে অভ্যর্থনায় কাল রাত্তিরটা কেটেচে। এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানী দাসী! মাথায় একখানা ফুলে-ওঠা খোঁপা, গাল দুটো ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ছোট, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি; কবিরা সৌন্দর্য্যের যেরকম বর্ণনা করে থাকেন, তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের; অথচ মোটের উপর দেখতে ভাল লাগে; যেন

মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাস বশত ভোরে উঠে জানালার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগ্তে আরম্ভ করেচে—সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল করে সচরাচর দেখ্তে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা দেখলেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহ-যাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত মেয়েদেরই হাতে,—এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রীলাভ করে। বিলা-সের জড়তায় কিম্বা যে কারণেই হোক্, মেয়েরা যেখানে এই কর্ম্মপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্য্য হানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইচে, এ আমার দেখতে ভারি সুন্দর লাগ্চে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুন্তে পাচ্চি, আর মনে মনে ভাব্‌চি মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার

আলোর মত একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবন-চাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।

কোবে

১৩

নতুনকে দেখতে হলে, মনকে একটু বিশেষ করে বাতি জ্বালাতে হয়। পুরোণোকে দেখতে হলে, ভাল করে চোখ মেলতেই হয় না। সেই জন্যে নতুনকে যত শীঘ্র পারে দেখে নিয়ে, মন আপনার অতিরিক্ত বাতিগুলো নিবিয়ে ফেলে। খরচ বাঁচাতে চায়, মনোযোগকে উস্‌কে রাখতে চায় না।

মুকুল আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল,—দেশে থাকতে বই পড়ে, ছবি দেখে জাপানকে যেরকম বিশেষভাবে নতুন বলে মনে হত, এখানে কেন তা হচ্চে না?—তার কারণই এই। রেঙ্গুন থেকে আরম্ভ করে, সিঙাপুর, হংকং দিয়ে আসতে আসতে মনের নতুন দেখার বিশেষ আয়োজনটুকু ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসে। যখন বিদেশী সমুদ্রের এ-কোণে ও-কোণে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলো উঁকি মারতে থাকে, তখন বলতে থাকি, বাঃ! তখন মুকুল বলে, ঐখানে নেবে গিয়ে থাকতে বেশ মজা! ও মনে করে এই নতুনকে প্রথম দেখার উত্তেজনা বুঝি চিরদিনই থাকবে; ওখানে ঐ ছোট ছোট পাহাড়গুলোর সঙ্গে গলা-ধরাধরি করে, সমুদ্র বুঝি চিরদিনই এই নতুন ভাষায় কানাকানি করে; যেন

ঐখানে পৌঁছলে পরে সমুদ্রের চঞ্চলনীল, আকাশের শান্তনীল আর ঐ পাহাড়গুলোর ঝাপ্‌সানীল ছাড়া আর কিছুর দরকারই হয় না। তার পরে বিরল ক্রমে অবিরল হতে লাগল, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের জাহাজ এক-একটা দ্বীপের গা ঘেঁষে চল্‌ল; তখন দেখি দূরবীন টেবিলের উপরে অনাদরে পড়ে থাকে, মন আর সাড়া দেয় না। যখন দেখবার সামগ্রী বেড়ে ওঠে, তখন দেখাটাই কমে যায়। নতুনকে ভোগ করে নতুনের ক্ষিদে ক্রমে কমে যায়।

হপ্তাখানেক জাপানে আছি, কিন্তু মনে হচ্চে যেন অনেক দিন আছি। তার মানে, পথঘাট, গাছপালা, লোকজনের যেটুকু নতুন, সেটুকু তেমন গভীর নয়,—তাদের মধ্যে যেটা পুরোণো সেইটেই পরিমাণে বেশী। অফুরান নতুন কোথাও নেই; অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত খাপ খায় না, জগতে এমন অসঙ্গত কিছুই নেই। প্রথমে ধাঁ করে চোখে পড়ে যেগুলো হঠাৎ আমাদের মনের অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না।—তারপরে পুরোণোর সঙ্গে নতুনের যে যে অংশের রঙে মেলে, চেহারায় কাছাকাছি আসে, মন তাড়াতাড়ি সেইগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। তাস খেল্‌তে বসে আমরা হাতে কাগজ পেলে রং এবং মূল্য-অনুসারে তাদের পরে পরে সাজিয়ে নিই,—এও সেই রকম। শুধু ত নতুনকে দেখে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে যে ব্যবহার করতে হবে; কাজেই মন তাকে নিজের পুরোণো কাঠামোর মধ্যে যত শীঘ্র পারে গুছিয়ে নেয়। যেই গোছানো হয়, তখন দেখতে

পাই, তত বেশী নতুন নয়, যতটা গোড়ায় মনে হয়েছিল; আসলে পুরোণো, ভঙ্গীটাই নতুন।

তারপরে আর এক মুস্কিল হয়েচে এই যে, দেখতে পাচ্চি পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্ত্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হয়ে একই রকম চেহারা অথবা চেহারার অভাব ধারণ করেচে। আমার এই জানলায় বসে কোবে সহরের দিকে তাকিয়ে, এই যা দেখচি, এ ত লোহার জাপান,—এ ত রক্তমাংসের নয়। একদিকে আমার জানলা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে সহর। চীনেরা যেরকম বিকটমূর্ত্তি ড্র্যাগন আঁকে—সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেচে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারি পিঠের আঁসের মত রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করচে। বড় কঠিন, বড় কুৎসিত,—এই দরকার নামক দৈত্যটা। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে, তা ফলে-শস্যে বিচিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু সেই অন্নকে যখন গ্রাস করতে যাই, তখন তাকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড করে তুলি; তখন বিশেষত্বকে দরকারের চাপে পিষে ফেলি। কোবে সহরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, মানুষের দরকার পদার্থটা স্বভাবের বিচিত্রতাকে একাকার করে দিয়েচে। মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হাঁ করতে করতে পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস করে ফেলচে। প্রকৃতিও কেবল দরকারের সামগ্রী, মানুষও কেবল দরকারের মানুষ হয়ে আসচে।

যে দিন থেকে কল্‌কাতা ছেড়ে বেরিয়েচি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড় করে দেখতে পাচ্চি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্চে, এর আগে কোন দিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোট করে দেখেছিল। ব্যবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা করে', বিদ্যাদান করে', আনন্দ দান করে' যারা টাকা নিয়েচে, মানুষ তাদের ঘৃণা করেচে। কিন্তু আজ-কাল জীবনযাত্রা এতই বেশী দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন ও শক্তি এতই বেশী বড় হয়ে উঠেচে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা কর্‌তে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ, টাকা দিয়ে বিচার কর্‌তে লজ্জা করে না। এতে করে সমস্ত মানুষের প্রকৃতি বদল হয়ে আস্‌চে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়্‌চে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি কর্‌তে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ কর্‌চে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আস্‌চে টাকাই যে, মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্চে। অথচ এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটচে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক সময়ে যে-মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা কর্‌তে জানত, এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা কর্‌চে। রাজ্যতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ঘরে বাইরে, সর্ব্বত্রই তার

পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠ্‌চে। কিন্তু বীভৎসতাকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, কেননা লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।

জাপানে সহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজ সজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশঃ বিদায় নিচ্চে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোষাক ছেড়ে আপিসের পোষাক ধরেচে। আজকাল পৃথিবী-জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েচে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেই জন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার বল্‌চে,—আমার ঐ হ্যাট্‌ কোটের দরকার আছে; আইনজীবীও তাই বল্‌চে, বণিকও তাই বল্‌চে। এমনি করেই দরকার জিনিষটা বেড়ে চলতে চলতে, সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিতভাবে একাকার ক'রে দিচ্চে।

এইজন্যে জাপানের সহরের রাস্তায় বেরলেই, প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। কারো কারো কাছে শুনতে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে কথা সত্য কি মিথ্যা জানিনে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়—সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েচে। ওরা দরকারকেই

সকলের চেয়ে বড় করে খাতির করেনি, সেই জন্যেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এপর্য্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে,—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্‌ল্‌ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম কর্‌লে—আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্‌ল্‌-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাক্‌তে পারত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপ মাত্র কর্‌লে না। এখানকার বাঙালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্লে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিক্লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানী বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে

দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেই জন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে—জাপানীকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশী গূঢ়। এর কারণই হচ্চে, এরা নিজেকে সর্ব্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে দেয় না।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কর্‌তে থাকা,—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেই জন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্চে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মত শব্দ করে না, সরোবরের জলের মত স্তব্ধ। এ পর্য্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেচি সবগুলিই হচ্চে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্য্য-বোধে। সৌন্দর্য্য-বোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখী, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্য্যভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেই জন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোণো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :—

পুরোণো পুকুর,

ব্যাঙের লাফ,

জলের শব্দ।

বাস্! আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোণো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়্‌তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কিরকম স্তব্ধ। এই পুরোণো পুকুরের ছবিটা কি ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইসারা করে দিলে—তার বেশী একেবারে অনাবশ্যক।

আর একটা কবিতা :—

পচা ডাল,

একটা কাক,

শরৎ কাল।

আর বেশী না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক বসে'। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্চে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এই-টুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয়,

তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।

এইখানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড় :—

স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য হচ্ছে ফুল, দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্চেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্চে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েচে। জাপান স্বর্গমর্ত্ত্যকে বিকশিত ফুলের মত সুন্দর করে দেখ্‌চে—ভারতবর্ষ বল্‌চে, এই যে একবৃন্তে দুই ফুল,—স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য, দেবতা এবং বুদ্ধ,—মানুষের হৃদয় যদি না থাকত, তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত ;—এই সুন্দরের সৌন্দর্য্যটিই হচ্চে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক্, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়—এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ কর্‌চে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, এ'কে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব্ব করে আর-একটাকে বাড়ানো চলে, এ আমরা দেখেচি। সৌন্দর্য্যবোধ এবং হৃদয়াবেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব্ব করে, সৌন্দর্য্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে

বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে,—এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েচে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এখানে এত বেশী করে' এবং এমন সর্ব্বত্র দেখতে পাই যে, স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও মৌমাছির দিক্-বোধের মত, আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে লোক অত্যন্ত গরীব, সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা করেও এক আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।

কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে, আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।

একটা বইয়ে পড়ছিলুম, প্রাচীন কালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশকালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পারবে, জাপানী নিজের

এই সৌন্দর্য্য-অনুভূতিকে সৌখীন জিনিষ বলে মনে করে না; ওরা জানে গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণটা হচ্চে শান্তি; যে সৌন্দর্য্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ, তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ করে, এবং যে উত্তেজনাপ্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে, এই সৌন্দর্য্যবোধ তাকে পরিশ্রান্ত করে।

সেদিন একজন ধনী জাপানী তাঁর বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তোমরা ওকাকুরার Book of Tea পড়েচ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জাপানীর পক্ষে এটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য কর্‌চে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটর যানে করে গিয়ে, প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ কর্‌লুম—সে বাগান ছায়াতে, সৌন্দর্য্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিষটা যে কি, তা এরা জানে। কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে, মাটির উপরে জিয়োমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানী-বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায়। জাপানীর চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্য্যের দীক্ষালাভ করেচে,—যেমন ওরা দেখতে জানে, তেমনি ওরা গড়তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত্ত-করা

একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তারপরে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোট ছোট গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বস্‌লুম। নিয়ম হচ্চে এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত করে স্থির করবার জন্যে, ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম কর্‌তে কর্‌তে, শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত—কারো মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বল্লেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ সমস্ত ঘর কি-একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্‌ কর্‌চে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে জিনিষ যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিষগুলিকে ঘেঁসাঘেঁসি করে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর কর্‌তে দেওয়ার মত। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা করে করে, স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত করে তুলে, তার

পরে এইরকম দুটি একটি ভালো জিনিষ দেখালে, সে যে কি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লুম। আমার মনে পড়্‌ল, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-এক-দিন এক-একটি গান তৈরি করে সকলকে শোনাতুম, তখন সকলেরই কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া বেঁধে কল্‌কাতায় এনে যখন বান্ধব-সভায় ধরেচি, তখন তারা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত করে রেখেচে। তার মানেই কল্‌কাতার বাড়ীতে গানের চারিদিকে ফাঁকা নেই—সমস্ত লোকজন ঘরবাড়ী, কাজকর্ম্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে। যে আকাশের মধ্যে তার ঠিক অর্থটি বোঝা যায়, সেই আকাশ নেই।

তারপরে গৃহস্বামী এসে বল্লেন,—চা তৈরি করা এবং পরিবেষণের ভার বিশেষ কারণে তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েচেন। তাঁর মেয়ে এসে, নমস্কার করে, চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে, চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মত। ধোওয়া মোছা, আগুন-জ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আস্‌বাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্ত্তব্য হচ্চে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ

দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে, নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্য্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়—কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই;—মনের উপর-তলায় সর্ব্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলি ঢেউ উঠচে,—তার থেকে দূরে, সৌন্দর্য্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্চে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্য্যবোধ, সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিষটা অন্তরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্ব্বল করে। কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেই জন্যেই জাপানীর মনে এই সৌন্দর্য্যরসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেচে।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বল্‌বার আছে। এখানে মেয়ে পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখ্‌তে পাইনে। অন্যত্র মেয়েপুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয় এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে

স্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই, তার প্রমাণ এই—নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি করে, এখানে স্ত্রীপুরুষের দেহ, পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল সহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্চে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে, তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহ-মুক্ত,—এটা আমার কাছে খুব একটা বড় জিনিষ বলে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করে নি বলেই এটা সম্ভবপর হয়েচে। আরো একটা জিনিষ দেখ্‌তে পাই। এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রায় সর্ব্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গী থাকে, যাতে বোঝা যায় তারা বিশেষভাবে পুরুষের মোহদৃষ্টির প্রতি দাবী রেখেচে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানীদের মধ্যে চরিত্রদৌর্ব্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বল্‌চি নে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে

প্রায় সকল সভ্যদেশেই মানুষ যে একটা কৃত্রিম মোহ-পরিবেষ্টন রচনা করেচে, জাপানীর মধ্যে অন্তত তার একটা আয়োজন কম বলে মনে হল, এবং অন্তত সেই পরিমাণে এখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত।

আর একটি জিনিষ আমাকে বড় আনন্দ দেয়, সে হচ্চে জাপানের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্র এত বেশী পরিমাণে এত ছোট ছেলেমেয়ে আমি আর কোথাও দেখি নি। আমার মনে হল, যে কারণে জাপানীরা ফুল ভালবাসে, সেই কারণেই ওরা শিশু ভালবাসে। শিশুর ভালবাসায় কোন কৃত্রিম মোহ নেই—আমরা ওদের ফুলের মতই নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত-ভাবে ভালবাসতে পারি।

কাল সকালেই ভারতবর্ষের ডাক যাবে, এবং আমরাও টোকিয়ো যাত্রা করব। একটি কথা তোমরা মনে রেখো—আমি যেমন যেমন দেখচি, তেম্নি তেম্নি লিখে চলেচি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন কি, অল্প পরিমাণেও "বস্তুতন্ত্রতা" দাবী কর ত নিরাশ হবে। আমার এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্তরূপে পাঠ্য-সমিতি নির্ব্বাচন করবেন না, নিশ্চয় জানি। জাপান সম্বন্ধে আমি যা কিছু মতামত প্রকাশ করে চলেচি, তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড়—তাহলেই ঠক্‌বে না। ভুল বল্‌ব না, এমন আমার

প্রতিজ্ঞা নয় ;—যা মনে হচ্চে তাই বল্‌ব, এই আমার মৎলব।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩
কোবে।

১৪

যেমন-যেমন দেখচি তেমনি-তেমনি লিখে যাওয়া আর সম্ভব নয়। পূর্ব্বেই লিখেচি, জাপানীরা বেশী ছবি দেয়ালে টাঙায় না, গৃহসজ্জায় ঘর ভরে ফেলে না। যা তাদের কাছে রমণীয়, তা তারা অল্প করে দেখে; দেখা সম্বন্ধে এরা যথার্থ ভোগী বলেই, দেখা সম্বন্ধে এদের পেটুকতা নাই। এরা জানে, অল্প করে না দেখলে পূর্ণ পরিমাণে দেখা হয় না। জাপান-দেখা সম্বন্ধেও আমার তাই ঘটচে ;—দেখবার জিনিষ একেবারে হুড়-মুড় করে চারদিক থেকে চোখের উপর চেপে পড়চে ;—তাই প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্ট করে সম্পূর্ণ করে দেখা এখন আর সম্ভব হয় না। এখন কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে চল্‌তে হবে।

এখানে এসেই আদর অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গেছি; সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারিদিকে তুফান লাগিয়ে দিয়েচে। এদের ফাঁক দিয়ে যে জাপানের আর কিছু দেখব, এমন আশা ছিল না। জাহাজে এরা ছেঁকে ধরে, রাস্তায় এরা সঙ্গে সঙ্গে চলে, ঘরের মধ্যে এরা ঢুকে পড়তে সঙ্কোচ করে না।

এই কৌতূহলীর ভিড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে, অবশেষে টোকিয়ো সহরে এসে পৌঁছন গেল। এখানে আমাদের চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা টাইক্কানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলুম। এখন থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথমেই জুতো জোড়াটাকে বাড়ির দরজার কাছে ত্যাগ করতে হল। বুঝলুম জুতো জোড়াটা রাস্তার, পা জিনিষটাই ঘরের। ধুলো জিনিষটাও দেখলুম এদের ঘরের নয়, সেটা বাইরের পৃথিবীর। বাড়ির ভিতরকার সমস্ত ঘর এবং পথ মাদুর দিয়ে মোড়া, সেই মাদুরের নীচে শক্ত খড়ের গদি; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধুলো পড়ে না, তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যে ধড়াধ্বড় পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

আর একটা ব্যাপার এই,—এদের বাড়ি জিনিষটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানালা, দরজা, যতদূর পরিমিত হতে পারে, তাই। অর্থাৎ বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। এ'কে মাজা ঘষা ধোওয়া মোছা দুঃসাধ্য নয়।

তারপরে, ঘরে যেটুকু দরকার, তা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দেয়াল মেজে সমস্ত যেমন পরিষ্কার, তেমনি ঘরের ফাঁক-টুকুও যেন তক্‌তক্‌ করচে, তার মধ্যে বাজে জিনিষের চিহ্নমাত্র পড়ে নি। মস্ত সুবিধে এই যে, এদের মধ্যে যাদের সাবেক

চাল আছে, তারা চৌকি টেবিল একেবারে ব্যবহার করে না। সকলেই জানে চৌকি টেবিলগুলো জীব নয় বটে, কিন্তু তারা হাত-পা-ওয়ালা। যখন তাদের কোনো দরকার নেই, তখনো তারা দরকারের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিরা আসচে যাচ্চে, কিন্তু অতিথিদের এই খাপগুলি জায়গা জুড়েই আছে। এখানে ঘরের মেজের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন তারা চলে যায়, তখন ঘরের আকাশে তারা কোনো বাধা রেখে যায় না। ঘরের একধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ করা কাষ্ঠখণ্ড ঝক্‌ঝক্ করচে, সেই দিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুলচে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুল-দানীর উপরে ফুল সাজানো। ঐ যে ছবিটি আছে, এটা আড়ম্বরের জন্যে নয়, এটা দেখবার জন্যে। সেইজন্যে যাতে ওর গা ঘেঁসে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সামনে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারি ব্যবস্থা রয়েচে। সুন্দর জিনিষকে যে এরা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই তা বোঝা যায়। ফুল সাজানোও তেমনি। অন্যত্র নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে—ঠিক যেমন করে বারুণীযোগের সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়, তেমনি,—কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই—ওদের জন্যে থার্ডক্লাসের গাড়ি নয়, ওদের জন্যে রিজার্ভ-করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।

ভোরের বেলা উঠে জানালার কাছে আসন পেতে যখন বসলুম, তখন বুঝলুম জাপানীরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ, তা নয়,—মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মত আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে, যে-জিনিষের মূল্য আছে গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারী। বস্তুবাহুল্য জীবন-বিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্যকতা নেই। চোখকে মিছিমিছি কোন জিনিষ আঘাত করচে না, কানকে বাজে কোন শব্দ বিরক্ত করচে না,—মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিষপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

যেখানে চারিদিকে এলোমেলো. ছড়াছড়ি নানা জঞ্জাল, নানা আওয়াজ,—সেখানে যে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের জীবনের এবং মনের শক্তিক্ষয় হচ্চে, সে আমরা অভ্যাসবশত বুঝতে পারি নে। আমাদের চারিদিকে যা কিছু আছে, সমস্তই আমাদের প্রাণ-মনের কাছে কিছু-না-কিছু আদায় করচেই। যে সব জিনিষ অদরকারী এবং অসুন্দর, তারা আমাদের কিছুই দেয় না—কেবল আমাদের কাছ থেকে নিতে থাকে। এমনি করে নিশিদিন আমাদের যা ক্ষয় হচ্চে, সেটাতে আমাদের শক্তির কম অপব্যয় হচ্চে না।

সেদিন সকালবেলায় মনে হল আমার মন যেন কানায়

কান্নায় ভরে উঠেচে। . এতদিন যেরকম করে মনের শক্তি বহন করেচি, সে যেন চালুনিতে জল ধরা, কেবল গোলমালের ছিদ্র দিয়ে সমস্তবেরিয়ে গেছে ; আর এখানে এ যেন ঘটের ব্যবস্থা। আমাদের দেশের ক্রিয়াকর্ম্মের কথা মনে হল। কি প্রচুর অপব্যয় ! কেবলমাত্র জিনিষপত্রের গণ্ডগোল নয়,—মানুষের কি চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, গলা-ভাঙাভাঙি ! আমাদের নিজের বাড়ির কথা মনে হল। বাঁকাচোরা উঁচুনীচু রাস্তার উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলার মত সেখানকার জীবনযাত্রা। যতটা চল্‌চে তার চেয়ে আওয়াজ হচ্চে ঢের বেশী। দরোয়ান হাঁক দিচ্চে, বেহারাদের ছেলেরা চেঁচামেচি কর্‌চে, মেথরদের মহলে ঘোরতর ঝগড়া বেধে গেছে, মাড়োয়াড়ি প্রতিবেশিনীরা চীৎকার শব্দে একঘেয়ে গান ধরেচে, তার আর অন্তই নেই। আর ঘরের ভিতরে নানা জিনিসপত্রের ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা,—তার বোঝা কি কম ! সেই বোঝা কি কেবল ঘরের মেঝে বহন কর্‌চে ! তা নয়,—প্রতিক্ষণেই আমাদের মন বহন কর্‌চে। যা গোছালো, তার বোঝা কম ; যা অগোছালো, তার বোঝা আরো বেশী,—এই যা তফাৎ। যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেঁচায়, কম জিনিষ ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্ব্বক কাজ কর্‌তে যাদের আশ্চর্য্য দক্ষতা,—সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জমে উঠচে, তার কি হিসেব আছে ?

জাপানীরা যে রাগ করেনা, তা নয়,—কিন্তু সকলের কাছেই একবাক্যে শুনেছি, এরা ঝগড়া করে না। এদের গালাগালির

অভিধানে একটিমাত্র কথা আছে—বোকা—তার ঊর্দ্ধে এদের ভাষা পৌঁছায় না! ঘোরতর রাগারাগি মনান্তর হয়ে গেল, পাশের ঘরে তার টুঁশব্দ পৌঁছল না,—এইটি হচ্চে জাপানী রীতি। শোকদুঃখ সম্বন্ধেও এই রকম স্তব্ধতা।

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক হত, তাহলে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাক্‌ত না। কিন্তু এইত দেখচি, এরা ঝগড়া করে না বটে, অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে প্রাণ নিতে এরা পিছ্‌পাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের ত কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি, তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্য্যবোধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেচি, তখন এদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে, "এটা আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদে পেয়েচি। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের একদিকে সংযম আর একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম যে মধ্যপথের ধর্ম্ম।"

শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ত আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে ত এমন আশ্চর্য্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুল্‌তে পারে নি। আমাদের কল্পনায়

ও কাজে এমনতর প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল ?

একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হল এ যেন দেহ-ভঙ্গীর সঙ্গীত। এই সঙ্গীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গীবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না ;—সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মত একসঙ্গে দুল্‌তে দুল্‌তে সৌন্দর্য্যের পুষ্পবৃষ্টি করচে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্দ্ধনারীশ্বরের মত, আধখানা ব্যায়াম আধখানা নাচ ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্য্য-লীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গীর মধ্যে লালসার ইসারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জাপানীর মনে এমন সত্য যে, তার মধ্যে কোনোরকমের মিশল তাদের দরকার হয় না, এবং সহ্য হয় না।

কিন্তু এদের সঙ্গীতটা আমার মনে হল বড় বেশীদূর এগোয় নি। বোধ হয় চোক আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিস্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশী আনাগোনা করে, তাহলে অন্য রাস্তাটায় তার ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হচ্চে অবনীর, গান জিনিসটা

গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্চে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানী রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেচে। যা কিছু চোখে পড়ে, তার কোথাও জাপানীর আলস্য নেই, অনাদর নেই; তার সর্ব্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধনা করেচে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপ-রসের যে বোধ দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েচে। য়ুরোপে সর্ব্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্ব্বজনীন সৈনিকতার চর্চ্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত,—কিন্তু এমনতর সর্ব্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেচে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েচে? অকর্ম্মণ্য হয়েচে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিম্বা অক্ষম হয়েচে?—ঠিক তার উল্টো। এরা এই সৌন্দর্য্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেচে; এই সৌন্দর্য্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য্য এবং কর্ম্মনৈপুণ্য লাভ করেচে। আমাদের দেশে একদল লোক আছে, তারা মনে করে শুষ্কতাই বুঝি পৌরুষ। এবং

কর্ত্তব্যের পথে চল্‌বার সদুপায় হচ্চে রসের উপবাস,—তারা জগতের আনন্দকে মুড়িয়ে ফেল্‌াকেই জগতের ভাল করা মনে করে।

য়ুরোপে যখন গেছি, তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়, তাদের ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপ খুব করে চোখে পড়েচে এবং মনকে অভিভূত করেচে। তবু "এহ বাহ্য।" কিন্তু জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ করে যা চোখে পড়ে, সে হচ্চে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি। সে অহঙ্কার নয়, আড়ম্বর নয়,—সে পূজা। প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে; এই জন্যে যতদূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে' আর-সমস্তকে তার কাছে নত করতে চায়। কিন্তু পূজা আপনার চেয়ে বড়কে প্রচার করে; এই জন্যে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয়। জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্চে। এদেশে আসবামাত্র সকলের চেয়ে বড় বাণী যা কানে এসে পৌঁছয় সে হচ্চে "আমার ভাল লাগল, আমি ভাল বাসলুম।" এই কথাটি দেশসুদ্ধ সকলের মনে উদয় হওয়া সহজ নয়, এবং সকলের বাণীতে প্রকাশ হওয়া আরো শক্ত। এখানে কিন্তু প্রকাশ হয়েচে। প্রত্যেক ছোট জিনিষে, ছোট ব্যবহারে, সেই আনন্দের পরিচয় পাই। সেই আনন্দ, ভোগের আনন্দ নয়,—পূজার আনন্দ। সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখি নি। এমন সাবধানে যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা

করে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে, অন্য কোনো জাতি শেখে নি। যা এদের ভাল লাগে, তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই প্রচুরতার পরিচয়, এবং স্তব্ধতাই গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেচে। এবং এরা বলে সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা থেকে পেয়েচে। এরা স্থির হয়ে শক্তিকে নিরোধ করতে পেয়েচে বলেই, সেই অক্ষুণ্ণ শক্তি এদের দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং বোধকে উজ্জ্বল করে তুলেচে।

পূর্ব্বেই বলেচি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়—কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি, তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়কে প্রকাশ করে, সেই বড়র কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হতে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লিতে যেখানে প্রাচীন হিন্দু রাজার কীর্ত্তিকলার বুকের মাঝখানে কুতুবমিনার অহঙ্কারের মুষলের মত খাড়া হয়ে আছে, সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়, কিম্বা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত করবার জন্যে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন করেচে, সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু যখন তাজমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন এ তর্ক মনে আসে না যে, এটা হিন্দুর কীর্ত্তি, না মুসলমানের কীর্ত্তি। তখন এ'কে মানুষের কীর্ত্তি বলেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সেটা অহঙ্কারের প্রকাশ নয়,—আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেই জন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এই জন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি, সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মত দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্ব্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রুর কর্ম্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে,—সেত হিংসা নয়।

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েচি—সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়—কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেচে, অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেচি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে, সবই আমাদের শেখবার—এ কথা মানি; কিন্তু যত ব্যবহার আছে, সবই যে আমাদের নেবার—এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিষ, তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে—এ কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই জন্যেই, জাপানে যে সব ভারতবাসী এসেছে, তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই তারা ত য়ুরোপের নানা

অনাবশ্যক, নানা কুশ্রী জিনিষও নকল করেচে; কিন্তু তারা কি জাপানের কোনো জিনিষই চোখে দেখতে পায় না? তারা এখান থেকে যে সব বিদ্যা শেখে, সেও য়ুরোপের বিদ্যা—এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্যরকম সুবিধা আছে, তারা কোনোমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিষ কিছুই দেখি নে?

আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিষ আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি, এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসঙ্কোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তাহলে আমাদের ঘর দুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েচে, তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্চে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের যত লজ্জা সমস্ত কেবল য়ুরোপের কাছে,—তাই য়ুরোপের ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে তালি-দেওয়া অদ্ভুত আবরণে আমরা লজ্জা রক্ষা করতে চাই। এদিকে জাপান-প্রবাসী ভারতবাসীরা বলে, জাপান আমাদের এসিয়াবাসী বলে অবজ্ঞা করে; অথচ আমরাও জাপানকে এম্‌নি অবজ্ঞা করি যে, তার আতিথ্য গ্রহণ করেও প্রকৃত জাপানকে চক্ষেও দেখি নে, জাপানের ভিতর দিয়ে

বিকৃত য়ুরোপকেই কেবল দেখি। জাপানকে যদি দেখতে পেতুম, তাহলে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা, অশুচিতা অব্যবস্থা, অসংযম আজ দূরে চলে যেত।

বাঙলা দেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েচে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করচি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিষটা যে কত বড় জিনিষ, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড় সম্পদ, কেবলমাত্র সৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে—তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

টোকিয়োতে আমি যে শিল্পীবন্ধুর বাড়ীতে ছিলুম, সেই টাইক্কানের নাম পূর্ব্বেই বলেচি, ছেলেমানুষের মত তাঁর সরলতা; তাঁর হাসি, তাঁর চারিদিককে হাসিয়ে রেখে দিয়েচে। প্রসন্ন তাঁর মুখ, উদার তাঁর হৃদয়, মধুর তাঁর স্বভাব। যত দিন তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জানতেই পারি নি তিনি কত বড় শিল্পী। ইতিমধ্যে য়োকোহামায় একজন ধনী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তির আমরা আতিথ্য লাভ করেচি। তাঁর এই বাগানটি নন্দনবনের মত এবং তিনিও সকল বিষয়ে এখানকারই যোগ্য। তাঁর নাম "হারা"। তাঁর কাছে শুনলুম, য়োকোয়ামা টাইক্কান এবং তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও

না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েচেন। হারার বাড়িতে টাইক্কানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে সৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি সংযম। বিষয়টা এই ; চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে ভোর হয়ে চলেচে—তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্চে, তাতে তার নেই ; তার পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালা যে খাড়া পর্দ্দার প্রচলন আছে, সেই রেশমের পর্দ্দার উপর আঁকা। মস্ত পর্দ্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটখাটো কিম্বা জবড়জঙ্গ কিছুই নেই—যেমন উদার, তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না—নানা রং, নানা রেখার সমাবেশ নেই—দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড় এবং খুব সত্য। তারপরে তাঁর ভূদৃশ্যচিত্র দেখলুম। একটি ছবি,—পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণচাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্চে—আর কিছু না—জলের কোনো রেখা পর্য্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা, —এটা যে জল, সে কেবলমাত্র ঐ নৌকা আছে বলেই বোঝা যাচ্চে, ; আর এই সর্ব্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত কিছু কালিমা,—সে কেবলি ঐ দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁকতে চেয়েচেন, যার

রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ—জ্যোৎস্নারাত্রি,—অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্তু আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই, তাহলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলবে না। হারা সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সঙ্কীর্ণ ঘরে, সেখানে একদিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দ্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দ্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে—প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, শাদা শাদা ফুল ধরেচে—ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরে ঝরে পড়চে ;—বৃহৎ পর্দ্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখা দিয়েছে—পর্দ্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্চে একটা অন্ধ হাতজোড় করে সূর্য্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য্য, আর সোনায় ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে,—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা—তমসো মা জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠ্‌চে। অথচ আলোয় আলোময়—তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

কাল শিমোমুরার আর একটা ছবি দেখ্‌লুম। পটের আয়তন ত ছোট, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র। সাধক তার ঘরের মধ্যে বসে ধ্যান করচে—তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারদিকে

আক্রমণ করেচে। অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক জন্তুর মত তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত—তাদের কেউ বা খুব সমারোহ করে আস্‌চে, কেউ বা আড়ালে আবডালে উঁকিঝুঁকি মারচে। কিন্তু তবু এরা সবাই বাইরেই আছে—ঘরের ভিতরে তার সাম্‌নে সকলের চেয়ে তার বড় রিপু বসে আছে—তার মূর্ত্তি ঠিক বুদ্ধের মত। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ্‌লেই দেখা যায়, সে সাঁচ্চা বুদ্ধ নয়,—স্থূল তার দেহ, মুখে তার বাঁকা হাসি। সে কপট আত্মম্ভরিতা, পবিত্র রূপ ধরে এই সাধককে বঞ্চিত করচে। এ হচ্চে আধ্যাত্মিক অহমিকা, শুচি এবং সুগম্ভীর মুক্তস্বরূপ বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধরে আছে—একেই চেনা শক্ত—এই হচ্চে অন্তরতম রিপু, অন্য কদর্য্য রিপুরা বাইরের। এইখানে দেবতাকে উপলক্ষ্য করে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিকে পূজা করচে।

আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারা সান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হাস্যে ঔদার্য্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্ব্বসাধারণের জন্যে নিত্যই উদ্‌ঘাটিত। মাঝে মাঝে বিশ্রামগৃহ আছে,—যে খুসি সেখানে এসে চা খেতে পারে। একটা খুব লম্বা ঘর আছে, সেখানে যারা বনভোজন করতে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। হারা সানের মধ্যে কৃপণতাও নেই, আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চারদিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মত তিনি মূল্যবান জিনিষকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করে রাখেন না,—তার মূল্য

তিনি বুঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত করতে জানেন।

১৫

এসিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্ব্বজয়ী হয়ে উঠেচে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোন-কালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।

এই কথাটি যেম্‌নি তার মাথায় ঢুক্‌ল, অম্‌নি সে আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল কারখানা, আপিস আদালত, আইন কানুন যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের যাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্ব্বলোকে একেবারে আস্ত উপ্‌ড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মত শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়;—তাকে জামাইয়ের মত একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে—য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল

শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে' পড়ল না তা নয়,—পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগ্‌ল। প্রথম কিছু দিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেচে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পূরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এত বড় আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস ত যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্ত্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে! শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তাহলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমত ব্যবহার করবার মত মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুল্লে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ কথা মান্‌তেই হবে, এ জিনিষ তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি,—ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেই জন্যেই যেম্‌নি তার চৈতন্য হল, অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল, সেটা বাইরের—অর্থাৎ একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা, সেইটুকু মাত্র;—তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দু'রকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর, আর এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা ঐকান্তিক ভেদ আছে, এমন কথা বল্‌তে চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে পড়ে চল্‌তে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে পড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম—লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এই জন্যে সে এক দৌড়ে দু' তিন শো বছর হু হু করে পেরিয়ে গেল। আমাদের মত যাঁরা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্চে, তারা অভিমান করে বলে, "ওরা ভারি হাল্‌কা, আমাদের মত গাম্ভীর্য্য থাক্‌লে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ করতে পারত না। সাঁচ্চা জিনিস কখনও এত শীঘ্র গড়ে উঠ্‌তে পারে না।"

আমরা যাই বলি না কেন, চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি এসিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারচে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েচে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েচে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিট্‌ত না, এবং বর্ম্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

মনের যে জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল

প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেচে, সেটা জাপানী পেয়েচে কোথা থেকে ?

জাপানীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্য্যরক্তেরও মিশ্রন ঘটেচে। জাপানীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইক্কানকে বাঙালী কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানী বলে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেচি।

যে জাতির মধ্যে বর্ণসঙ্করতা খুব বেশী ঘটেচে তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখ্‌তে চাই, তাহলে বর্ব্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেচে, তারা অল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেচে। তাই আদিম অষ্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না—আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বল্লেই হয়।

কিন্তু গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল, যেখানে একদিকে এসিয়া, একদিকে ইজিপ্ট, একদিকে য়ুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেচে।

গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না—রোমকেরাও না। ভারত-বর্ষেও অনার্য্যে আর্য্যে যে মিশ্রন ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানীকেও দেখ্‌লে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব্ব করে—জাপানীর মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রন হয়েচে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেচি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্র-কলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী, সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেচি—কিন্তু জাপানীরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েচে। যে জাতির মনের মধ্যে চলন্-ধর্ম্ম প্রবল, সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতি-সঙ্করতা নয়, স্থান-সঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েচে। ছোট জায়গাটি সমস্ত জাতির

মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেচে। বিচিত্র উপকরণ ভালরকম করে গলে' মিলে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেচে। চীন বা ভারতবর্ষের মত বিস্তীর্ণ জায়গায়, বৈচিত্র কেবল বিভক্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম, এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার করতে পেরেচে। আজকের দিনে এসিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম্ম আছে, যে জন্য চীন কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পেরেচে; আর একদিকে অল্প পরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবতে, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেচে। তাই যে-মুহূর্ত্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে, আত্মরক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেচে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম [illegible], জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চল্‌তে পেরেচে, এবং তাতে-করে

তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্চে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি করচে; সুতরাং নিজের বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারচে। এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্চে না, তা নয়,—কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেচে। প্রথম প্রথম যা অসঙ্গত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্চে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্ত্তন ঘটে সুসঙ্গতি জেগে উঠচে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেচে, আর একদিন সেটাকে ত্যাগ করচে—একদিন যে আপন জিনিসকে পরের হাটে সে খুইয়েচে, আর একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্চে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চল্‌চে। যে বিকৃতি মৃত্যুর, তাকেই ভয় করতে হয়—যে বিকৃতি প্রাণের লীলা-বৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয়, প্রাণ আপনি তাকে সাম্‌লে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম, তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেচে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে জাপানীর এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালীই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেচে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মত তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেচে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েচে কিনা

সন্দেহ। তারপরে বাঙালী ভারতের যে প্রান্তে বাস করে, সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে, অথবা অন্য যে কারণেই হোক্, আচার-ভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত এক-ঘরে হয়ে ছিল—তাতে করে তার একটা সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল—এই কারণেই বাঙালীর চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে যত সহজ হয়েছিল, এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মত আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই, তার বেশী আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালী সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানাদিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠচে—তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালীর ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরচে। বস্তুত ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি। যা-কিছু ইংরেজি, তার দিকে বাঙালীর উদ্বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকল রকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্য বাঙালীই সর্ব্ব-

প্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল, তখন বাঙালীর মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠল—সেটা হচ্চে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালীর মনে সকলের চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠেচে। আজ আমরা যে সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা করচি, সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এই জন্যই সেটা এমন সুতীব্র—সেটা ব্যাধির প্রকোপের মত পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেচে।

বাঙালীর মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলন-ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড় বেদনাই আমাদের মনে থাক্, এ কথা আমাদের ভুল্‌লে চলবে না যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালীর উপরেই পড়েচে। এই জন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা পূর্ব্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখতে পেয়েছিলেন, সে ত শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়—সে হচ্চে জ্ঞানে প্রাণে উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্ম্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের

দীক্ষা গ্রহণ করেচে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেচে। কিন্তু আমি যতটা দেখেচি, তাতে আমার মনে হয় য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্ম্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃত লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেচে,—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানী সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সেই হচ্চে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড় জিনিষ যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্চে কৃতকর্ম্মতা,—সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড় দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্ম্মণির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিক-দের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেচে; নীট্‌শের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্য্যন্ত জাপান ভাল করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্ম্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্ম্মটা কি। কিছু দিন এমনও তার সঙ্কল্প ছিল যে, সে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করবে। তখন তার

বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় করেচে, সেই ধর্ম্ম হয়ত তাকে শক্তি দিয়েচে—অতএব খৃষ্টানীকে কামানবন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েচে যে, খৃষ্টানধর্ম্ম স্বভাবদুর্ব্বলের ধর্ম্ম, তা বীরের ধর্ম্ম নয়। য়ুরোপ বল্‌তে সুরু করেছিল—যে-মানুষ ক্ষীণ, তারই স্বার্থ নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে-ধর্ম্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল, সে-ধর্ম্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেচে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করচে। এই অবজ্ঞা আর কোনো দেশে চল্‌তে পারত না; কিন্তু জাপানে চল্‌তে পারচে, তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না, এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব্ব বোধ করচে—সে জান্‌চে পরকালের দাবী থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে ধর্ম্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, সে হচ্চে শিন্তো ধর্ম্ম। তার কারণ এই ধর্ম্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক; আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম্ম রাজাকে এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের দেবতা বলে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মত এক-মহাল

নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heavenকে স্বীকার করে আসচে। সেখানে নম্র যে, সে জয়ী হয়; পর যে, সে আপনার চেয়ে বেশী হয়ে ওঠে। কৃতকর্ম্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক্, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিৎ,—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না—শেষ পর্য্যন্তই এ টিঁকে থাক্‌বে, এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড় জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশী মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পদচিহ্ন দেখ্‌তে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন, সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার কাজে বাঙ্গালীর আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্চে।

সমাপ্ত